Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারিনা। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
কোভিড বিপর্যস্ত দেশ ১
দেশে-বিদেশে ২
নজরদারির আন্তর্জাল ৩
ধর্মেন্দ্র প্রধান .....উন্মুখ ৪
ড. অরবিন্দ পোদ্দারের স্মরণসভা ৫
মোদী সরকারের অপকীর্তি... ৬
তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি'র পরিবর্ত নয় ৭
করোনায় মনের অসুখ ৮

68th Year 36th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 31st July 2021

সম্পাদকীয়

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে...

যেকোনো রাষ্ট্রে বা সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন মানবজীবন নিশ্চিত হওয়া একান্ত কাম্য। সমস্ত মানুষের শুধু বেঁচে থাকাই নয়, সসম্মান জীবনযাপনের অধিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন সরকারি দাক্ষিণ্য বা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচার মানে অবশ্যই আত্মঅবমাননার অপরিসীম জ্বালায় দগ্ধ হওয়া।

পরাধীন ভারতবর্ষের আপামর মানুষের স্বশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বহু সংখ্যক অসমসাহসী যুবক যুবতীর গভীর আত্মত্যাগ উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছিল। আপসপন্থার পূজারী মহাত্মা গান্ধিই হোন কিংবা অনুশীলন সমিতি আদি বিপ্লবপন্থার অনুসরণকারীরাই হোন, সকলেরই একান্ত প্রার্থনা ছিল এক সম্মুখগতি সম্পন্ন স্থবিরতা বিরোধী স্বাধীন দেশ গড়ে তোলা। এমন দেশের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা পিছিয়ে থাকা সমাজের মানুষও আপন অধিকারে বলীয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচবেন।

উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীন ভারতে চরম আত্মত্যাগ করা পূর্বোক্ত বহু মানুষের স্বপ্ন অধরাই থেকেছে। পূর্ণত এক ভয়শূন্য চিত্তের বিকাশ ঘটেনি। বহুসংখ্যক মানুষের অধিকার সর্বতোভাবে খণ্ড ক্ষুদ্র হয়েই থেকেছে। আর দেশের মানবসমাজের বৃহদংশকে ক্রমাগত অনধিকারের যাতনা ভোগে বাধ্য করা হয়েছে। নিত্য অপমানিত মানুষদের বাধ্য করা হয়েছে বিনা প্রতিবাদে ভবিতব্য হিসেবে আত্মনিগ্রহ মেনে বেঁচে থাকতে। বিশাল ভারত ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্র ধর্মের নামে, জাতির নামে ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধকেও দলিত করা হয়েছে। ইদানিং অনেক বর্ধিত হয়েছে সেই অপরাধ।

অতীত অভিজ্ঞতা অবশ্যই উজ্জ্বল নয়। মানুষকে বিশেষ করে, অবহেলিত অংশের মানুষদের সচেতন প্রতিবাদের পথে চালনা করার উদ্যোগ যাঁরাই নিয়েছেন, তাঁদের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক অপশক্তির সাম্রাজ্যিক আস্ফালনে বহুসংখ্যক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্বোদ্ধত নিয়ামকবৃন্দ কলঙ্কিত হয়েছে বারংবার। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বাগাড়ম্বর করা ভারতভূমি কী একই ধরনের কলঙ্কজনক আচরণের পুনরাবৃত্তি করছেন না!

ইদানিং ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের কর্মপদ্ধতির দিকে লক্ষ করলে প্রকৃতই পুরাতন দিনের অন্ধকারক্লিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলিকেও তুচ্ছ বলে মনে হবার প্রভূত কারণ দেখা যাচ্ছে। একটি স্বাধীন দেশে কেন এক অতি বৃদ্ধ সৎজীবন যাপন করা আদর্শ ব্যক্তিত্বকে শুধুমাত্র দরিদ্র অবহেলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকারবোধ জাগ্রত করার অপরাধে চরম রাষ্ট্রিক নিপীড়নে কারাবন্দি অবস্থায় নিহত হতে হবে? তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবোধকে মেনে চলতেন না বলে কি? তিনি কি ধর্মান্ধ অপশক্তির অবিচারের শিকার হলেন? নাকি প্রসঙ্গটির শিকড় আরও গভীরে? শুধু কি ফাদার স্ট্যান স্বামীই নিহত হলেন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অত্যাচারে, নাকি আরও বহু আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানবিক অধিকারের পক্ষে সংগ্রাম করা মানুষও ভারতের বহু কারাগারে নিপীড়িত জীবনে বছরের পর বছর নিগৃহীত হয়েই চলেছেন?

জনগণের নামে উৎসর্গীকৃত (!) নেতারা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় রত। কত না তাঁদের রং ঢং! কত না বাহারী পোশাকে নিত্যনতুন চমক সৃষ্টির অশালীন বিজ্ঞাপন। তাঁদের অপদার্থতা সীমাহীন আর সে সবেরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে দাগিয়ে দেওয়া। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনকে ঢালাও ব্যবহার করা হচ্ছে সমস্ত নৈতিকতাকে বরবাদ করে। শুধু তো দেশদ্রোহিতার মামলাই নয়, ইউ এ পি এ'র মত দানবীয় আইন প্রযুক্ত হচ্ছে যত্রতত্র। বিচারকদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে আর কীভাবে মানুষের অধিকার রক্ষা করা যাবে?

কোভিড বিপর্যস্ত দেশ

লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ মোদীর নির্লজ্জ মিথ্যাচার

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রায় সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তান্ডব চালিয়েই যাচ্ছে। ২০১৯-এর নভেম্বর মাসে চিনের উহান শহরে শুরু। ২০২০ সালে অতি দ্রুত দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ওই বছরের শেষদিকে সামান্য কমলেও ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকেই আবার যেন আরও শক্তি সংগ্রহ করে এই ভাইরাল সংক্রমণ অতি হিংস্র তাণ্ডব শুরু করে। এখন জুলাই মাসের শেষ। তবুও পুরোপুরি কমার তেমন লক্ষণ নেই। দ্বিতীয়বারে যে সংখ্যায় মানুষের মৃত্যু হয়েই চলেছে তা, প্রথমবারের তুলনায় যথেষ্টই বেশি। ভারতের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

প্রথম বছর অর্থাৎ, ২০২০ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আচমকা অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিল। একের পর এক কেলেঙ্কারি করে গেছে। এসব এখন কিছুটা অতীত। দেশের সাধারণ মানুষ তাদের জীবন দিয়ে সরকারের অপদার্থতার দায় মিটিয়েছে। সরকার কোন শিক্ষা নিয়েছে বলে আদৌ মনে হয় না। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র যত্নশীল হয়নি মোদী সরকার। বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত লজ্জাজনক বা সামান্যতম অর্থ বরাদ্দ করে দেশের মানুষকে বাঁচাতে। মোট জাতীয় উৎপাদনের এক শতাংশও খরচ হয় না জনস্বাস্থ্য খাতে। দেশের সংবিধানে বাঁচার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ বাঁচার জন্য যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা একান্ত জরুরি তা-ই অবহেলিত। সংবিধানের গ্রন্থে যা লেখা আছে তা, কোন গুরুত্বই পায় না।

সংবিধানের রক্ষক দেশের বা বিভিন্ন রাজ্যগুলির সরকার। তারাই যদি জেনে বুঝে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার উপেক্ষা করে চলে বছরের পর বছর তাহলে, দেশের মানুষ বাঁচবে কিভাবে? এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নেই। একটাই বাঁচোয়া যে, প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় বারে মোদী স্বয়ং তেমন কোনও কেরামতি দেখান নি। তিনি থালি বাজাও, তালি বাজাও, দিয়া জ্বালাও গোছের তেমন কিছু ২০২১-এ এখনও পর্যন্ত বলেন নি। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও ভোটে জেতার পরে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোল্লা আঁকেন নি। এই দুই স্বৈরশাসক অন্তত এটুকু শিক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা যতটুকু উন্নতি সম্ভব ছিল তা, কেউই করেন নি। জনকল্যাণকামিতার পরিবর্তে জনমোহিনী পথেই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

অতিমারি থেকে বাঁচার জন্য অতি উচ্চ খরচ সাপেক্ষ বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাই এইসব শাসকদের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য। এমনকি, যে অক্সিজেন ছাড়া রোগাক্রান্ত মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে অসহায়ের মতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন এবং পড়ছেন সেটুকুর যথাযথ ব্যবস্থাও হয়নি। আর দেশের সংসদে সরকার নির্লজ্জের মতো জানাচ্ছে যে, অক্সিজেনের অভাবে যে অনেকের মৃত্যু হয়েছে তা, সরকারি পরিসংখ্যানে কোথাও উল্লেখ নেই।

দেশের প্রধানমন্ত্রী যে এতটা চক্ষুলজ্জাহীন হবেন তা কল্পনাও করা যায়নি। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার শুধুমাত্র চরম ব্যর্থই হয়েছে, এমন নয়। শুধুমাত্র তথ্য পরিসংখ্যানে কারচুপি করে মৃতের সংখ্যা অনেক কম দেখানো হয়েছে তা-ও নয়। গঙ্গাযমুনা প্রভৃতি নদীতে অজস্র শবদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আদিত্যনাথ (ফেক) যোগীর রাজত্বের অপদার্থতায় সব চাইতে বেশি। আর দেশের প্রধানমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন যে, ওই রাজ্যের সরকার কোভিড-সংক্রমণ মোকাবিলায় সর্বাধিক সাফল্য পেয়েছে। যাঁরা বেওয়ারিশ শবগুলি নদীর বহমান জলধারা থেকে উদ্ধার করে কোনক্রমে সেগুলি কবরস্থ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মোদীর নামে থুথু ছিটিয়েছে। মৃত মানুষদের দেহগুলি মর্যাদাসহ সৎকারের ব্যবস্থাও এইসব সরকার করেনি।

কোভিড-১৯ সংক্রমণে যাঁরা অসহায়ের মতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কিংবা যেসব পরিবারগুলি তাঁদের প্রিয়জনের জীবনরক্ষায় সর্বস্ব হারিয়ে দারিদ্রসীমার অনেক নীচে নিক্ষিপ্ত হলেন তাঁদের দুর্দশার কথা, বিয়োগান্তক পরিস্থিতির বিষয় বিবরণের অতীত। তাঁদের হা-হুতাশভরা দীর্ঘশ্বাস দেশের বাতাস ভারি করেই চলবে। কতদিনে যে এই পরিবারগুলি কিছুটা সামলে উঠবেন তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। মানুষের এমন দুর্দশা স্বাধীন ভারতে আর কখনো হয়েছে বলে তথ্য নেই। ব্যক্তিগত স্তরে অনেকে সর্বহারা মানুষদের প্রতি সংবেদনশীল সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন। কোন কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশই বামপন্থী মননসম্পন্ন তাঁরা, দুস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু, যে কাজ দেশের সরকারের পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে করা উচিত তা, কোনও বেসরকারি উদ্যোগে যথাযথভাবে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। শুধু সদিচ্ছা থাকলেই তা আদৌ সম্ভব নয়।

বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে বারংবার সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, এখনও হচ্ছে যে, আয়করের আওতায় যাঁরা পড়েন না তাঁদের সবাইকে মাসে অন্তত পক্ষে সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণকুহরে সেই মানবিক আবেদন অদ্যাবধি প্রবেশ করেনি।

অথচ সংবাদ মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র আকারে হলেও প্রকাশিত হচ্ছে যে, দেশের বেশ কয়েকটি কর্পোরেট কোম্পানি বিশেষত, আদানি-আম্বানির মতো ধনকুবেরদের প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকা সহায়তা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। দেশের আপামর মানুষের সম্পদ যা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গচ্ছিত থাকে তা নির্বিবাদে সরকারের শ্রেণিস্বার্থ পূরণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ এক ন্যাক্কারজনক ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

কোভিড-১৯ অতিমারিতে যাঁরা দংশিত হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁদের দূরবস্থা সীমাহীন। কিন্তু এ দেশের বা বহু রাজ্যের সরকারের ঝোঁক শুধুমাত্র লকডাউন ঘোষণা করে দায়মুক্ত হওয়া। কত কোটি মানুষ যে এদেশে কাজ হারিয়েছেন তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। সি এম ই আই-এর সযত্ন নির্মিত তথ্য পরিসংখ্যানগুলির দিকে লক্ষ করলে শিহরিত হতে হয়। কর্মচ্যুত হয়েছেন বহু কোটি আর বহু কোটি মানুষ

এরপর ৪-এর পাতায়

দেশে বিদেশে

ধনকুবেরের বিকার

আমাজন কোম্পানির মালিক জেফ বেজোস বর্তমান দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ধনকুবের। এই মানুষটির কিংবা তাঁর পরিবারের সম্পত্তির বহর কতদূর বিস্তৃত এবং তার পরিমাণ কত, বলা কঠিন। ট্রিলিয়নের হিসেব। বাংলায় বলা যায় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। অনেকে আজকাল উল্লেখ করেন অর্বুদপতি বলে। জেফ বেজোসকে অর্বুদপতি বলেই বলা যাক, আমাদের আলোচনার প্রয়োজনে।

এই ধনকুবেরটি ইদানিং তাঁর সঞ্চিত সম্পত্তির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ব্যয় করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'নাসা' থেকে উৎক্ষিপ্ত মহাকাশ যানে অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করে এলেন। বিত্তবানের ঐশ্বর্যের বিকার। কত অর্থ খরচ হল তা বলা কঠিন। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ সবই তো বড়লোক বা বিত্তশালীদের উপভোগ করার বিষয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এমন সব বিলাসিতার কথা ভাবতেই পারেন না। অঢেল সম্পত্তি যাদের নেই তাদের জন্য কোনও বিলাসিতার প্রশ্নও নেই।

প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ জেফ বেজোসদের মতো ধনকুবেরদের ঐশ্বর্যের বিকার দেখে কেউ চমৎকৃত হন আবার কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। বিপুল পরিমাণে অর্থ খরচ করে অতি অল্প সময়ের জন্য এই ধনকুবের তাঁর আশ মিটিয়েছেন। এতে আপত্তি করার কোনও প্রসঙ্গ আসবে কেন? সত্যিই তো তাঁর উপার্জিত অর্থ তিনি কোথায় কিভাবে ব্যবহার করবেন তা একান্তভাবে তাঁরই বিবেচ্য। অন্যের কিছু বলার থাকে না।

কিন্তু, এই কোম্পানিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও প্রকার কর দেয় না, দিলেও তা এত নগন্য উল্লেখনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁর সঞ্চিত সম্পদের একাংশ কর ফাঁকির মাধ্যমে উপার্জিত। এটাই বিপুল বিত্তশালী ধনকুবেরদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কোনপ্রকার সামাজিক দায়িত্ব বহন করতে এরা সম্মত হয় না। আমেরিকায় যাহা সত্য ভারতেও তাহাই বাস্তব।

জেফ বেজোস তাঁর কোম্পানিতে কর্মরত অসংখ্য কর্মচারী বা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দেবার প্রশ্নে কঠোর অবস্থান নিয়ে থাকেন। তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের বঞ্চিত করেই চলেন। কয়েক মিনিটের জন্য তাঁর অন্তরীক্ষ বিহারে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার একটি অংশও যদি নিজের ব্যবসায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারী দরিদ্র মানুষগুলিকে দিতেন তা হলে, খুবই উপকার হত।

জেফ বেজোস তাঁর বিলাসিতাপূর্ণ বিকার সাধনে পৃথিবীর পরিবেশ বা আবহাওয়ায় ভালরকম ক্ষতি সাধন করলেন। তিনি কী জলবায়ু পরিবর্তনের সংশোধন করতে এক ডলারও খরচ করতে সম্মত হয়েছেন? আদৌ নয়। এরা শুধুই নেবে, দেবে না কিছুই। ইংলন্ডের আর এক ধনকুবের ভার্জিনিয়া বিমান কোম্পানির মালিক ব্রানসন একই অপরাধ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধেও নানা ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগ প্রচুর। বিশ্বের নানা প্রান্তে ধনকুবেরদের সামান্যতম মানবিকতাবোধও নেই যে, তাঁরা বর্তমান ভয়াবহ অতিমারি রোধে কোন অর্থ ব্যয় করবেন।

অবশেষে পেরুর রাষ্ট্রপতি হলেন কাস্টিল্লো

পেরু দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। রাজধানী লিমা। এই রাষ্ট্রেই অবস্থিত বহু শতাব্দী আগের উন্নত এক সভ্যতার নিদর্শন মাচু পিচুর ধ্বংসাবশেষ। সমগ্র বিশ্বের অতীত ইতিহাস অন্বেষণ ও গবেষণায় এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

পেরু দীর্ঘ বহুবছর যাবৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছে অতি লোভনীয় গন্তব্য। এই দেশের খনিজ সম্পদের ভান্ডার প্রায় অফুরন্ত। শুধুমাত্র তামার মতো খনিজ পদার্থ যে পরিমাণে আছে তা বিশ্বের অন্য কোনও দেশে নেই। অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদেও ভরপুর এই দেশটির ভূ-মৃত্তিকা। কিন্তু দেশের মাত্র সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর দারিদ্র অস্বাভাবিক। প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠিত হয় প্রতিনিয়ত। তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও দেশের সাধারণ মানুষের জীবন কিছুটা সহজ করতে কাজে লাগানো যায় না। অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নানা ফন্দিফিকির করে এদেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করে রয়েছে। তাদের সহায় অতি আগ্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এবারেই পেরুর রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হল। পেদ্রো কাস্টিল্লো নামে এক দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষক ও কৃষক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তিনি বামপন্থী ভাবধারার মানুষ। প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবিকাক্ষেত্রে যেসব দুস্তর সমস্যাবলী ছিল বা এখনও আছে, সেসব দূর করতে সারাদেশ জুড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে পেদ্রো কাস্টিল্লো জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। অভাবের মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁর জয়লাভ সহজসাধ্য হয় নি। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি সম্মিলিতভাবে কাস্টিল্লোকে পরাস্ত করার জন্য সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। বলতে গেলে বেশ অল্প ব্যবধানেই কাস্টিল্লোর জয়। নির্বাচিত হবার পরের কাহিনী কম রোমাঞ্চকর নয়। মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় তাঁর এমন জয়কে তাচ্ছিল্য করে শেষপর্যন্ত চেষ্টা চলেছে কোনভাবেই যেন এই দরিদ্র বিদ্যালয় শিক্ষকটি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিতে না পারেন। লাতিন আমেরিকার বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তিগুলি অবশ্যই পেরুর এমন ইতিবাচক পরিবর্তনকে ধরে রাখতে এবং আগামীদিনে শক্তিশালী করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

অবশেষে পেদ্রো কাস্টিল্লো পেরুর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তিনি শপথ নিয়েই বলেছেন যে, রাজধানী লিমার বিলাসবহুল রাষ্ট্রপতি ভবনে তিনি থাকবেন না। তিনি এই ভবনটিকে ঔপনিবেশিক অপশাসনের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, ওই বিশাল ভবনটি মিউজিয়ামে পরিণত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে তিনি যে বেতন পেতেন, সেই বেতনেই তিনি রাষ্ট্রপতির কাজ করবেন। তাঁর দারিদ্র সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা আছে। অনেকটা উরুগুয়ের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসে মুজিকার কথা মনে পড়ে। তিনি যেমন অতি সাধারণ জীবনযাপন করেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সমগ্র লাতিন আমেরিকায় হোসে মুজিকা বা পেপে মুজিকা এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে সুখ্যাত।

মোদীর পরিবর্ত হিসেবে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?

পশ্চিমবঙ্গের শাসন পরিচালনায় সর্বক্ষমতাময়ী কর্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে তাঁর দল বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। যে কোনভাবে ভোটে জিতলেই সমস্ত ধরনের অনৈতিকতার অভিযোগগুলির আর কোনও মান্যতা থাকতে পারে না! এটা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। বিগত দশ বছর যাবৎ এই রাজ্যে যে দুকূলপ্লাবী নৈরাজ্য চলছে তা আর কোনও বিবেচনার বিষয়ই নয়। মমতা দেবী নিজে নির্বাচনে তাঁরই এক অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী দীর্ঘকালের তৃণমূল নেতা এবং বর্তমানে বিজেপি নেতার কাছে নন্দীগ্রামে পরাস্ত হলেও কোনও ধরনের চক্ষুলজ্জার পরোয়া না করেই তিনি তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

এখন তিনি অতি উৎসাহে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তনে মুখ্য কুশীলবের ভূমিকায় অবতীর্ণা। নরেন্দ্র মোদীর অপশাসনে সারা দেশ এক ভয়াবহ অবস্থায়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক আস্ফালন এবং দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থেকে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের মুখে সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে চলেছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র নিজের কৃতিত্ব জাহির করতেই উচ্চকিত বিজ্ঞাপন নির্ভর হয়েই চলেছেন। এমন যন্ত্রণাদায়ক ও করুণ অভিজ্ঞতা দেশের মানুষের কখনোই হয়নি। মোদীর তুলনায় স্বাধীন ভারতের অতীত সমস্ত প্রধানমন্ত্রীই প্রায় দেবদূত। যে কোনভাবেই হোক্, দেশের মানুষ চাইছে মোদীর বিদায়। এক রাক্ষুসে শক্তি হিসেবে মোদী-শাহ এখন চরম ঘৃণার পাত্র।

পশ্চিমবঙ্গের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পরিচালনায় বিগত এক দশক রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা সৃষ্টি করে এখন তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। মোদী বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর সাধপূরণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকদিন রাজধানী দিল্লীতে তাঁর উদ্দেশ্যপূরণে অতি সক্রিয় সময় কাটালেন। ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে তা, এখনই বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিজেপি নামক বিষাক্ত দলটির অতি আস্থাভাজন হিসেবেই জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান।

১৯৯৮ সাল থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মন্ত্রী হিসেবেও তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। বাজপেয়ীজিও তাঁকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কলকাতায় এসে কালিঘাটের বাড়ি পৌঁছে মালপোয়াও খেয়ে এসেছেন। শুধু বাজপেয়ীজি কেন, আর এস এস পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জীকে মাথায় তুলে রেখেছে। এখন সকলেই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে আসার কৃতিত্বও মমতা ব্যানার্জী দাবি করতেই পারেন। এখন সঙ্গত প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এই মানুষটি কিংবা তাঁর রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস কি যথার্থই বিজেপি'র বিরোধিতায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেবে? নাকি এই বিশেষ সময়ে ঘোলাজলে মাছ ধরেই তিনি নিজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নেবেন!

বাস্তবে এবারের বিধানসভা ভোটে বিপুল জয় পেলেও তৃণমূল কংগ্রেস দলটির বহু প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতির অকাট্য অভিযোগ রয়েছে। সিবিআই, ইডি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছে। মোদীর সঙ্গে নরমে গরমে সম্পর্ক রেখেই নারদা-সারদা সামলানো হচ্ছে। এমন দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দল এবং নিজেকে বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে কি ভূমিকা নেবেন তা, বুঝে ওঠা বেশ শক্ত।

কৌতুককর হলেও সত্যি যে, তৃণমূল কংগ্রেস দলের সাংসদরা বিনা প্রশ্নে নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই তাঁকে সংসদীয় দলের শীর্ষপদে বরণ করে নিয়েছেন। বিধায়ক না হয়েও তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় দলের শীর্ষস্থানে থেকে মুখ্যমন্ত্রী। এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল্লীর ক্ষমতাশীর্ষে আরোহণের জন্য তিনি এম পি না হয়েও দলের এম পিদের শীর্ষস্থানে অভিষিক্ত। রাজনীতি আর কোনও নীতিনিষ্ঠ কার্যকলাপের নাম থাকছে না। কোন এক ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছায় তাঁর সাধপূরণের নিম্নশ্রেণির অস্ত্র হয়ে পড়েছে।

দেশজুড়ে কৃষক আন্দোলন

দেশজুড়ে কৃষক আন্দোলন চলছে লাগাতার। রাজধানী দিল্লীর সবকটি প্রবেশপথে জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের হাজার হাজার বিক্ষোভকারী শান্তিপূর্ণ অবরোধ জারি রেখেছেন। দীর্ঘ আট মাস অতিক্রান্ত। কৃষক আন্দোলনের দাবিগুলির কোনও নড়চড় ঘটেনি। তাঁরা দাবি করছেন যে সর্বতোভাবে অগণতান্ত্রিক পথে যে তিনটি কৃষি আইন মোদী সরকার লাগু করেছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। কোনও অজুহাত নয়, সর্বধরনের যুক্তিতেই এই কৃষি আইনগুলি দেশের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট ব্যবসার অতিলাভজনক ব্যবস্থায় পরিণত করতে উদগ্রীব। মুখ্যত নরেন্দ্র মোদী ঘনিষ্ঠ দুইটি বিপুলাকার কর্পোরেট কোম্পানী যথা, আদানি এবং আম্বানির দখলদারি নিশ্চিত করতেই মোদী সরকার এমন আইন প্রণয়ন করেছে। এ প্রসঙ্গে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মোদী সরকার আদানি-আম্বানির একান্ত আজ্ঞাবহ হিসেবেই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত শত্রুতা করেই চলেছে।

কৃষকদের আরও দাবি যে, নতুন এই সব কৃষি আইন লাগু হলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যবস্থা আর থাকবে না। কৃষকদের শস্য উৎপাদনের খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেলেও উৎপাদকদের বাঁচার সংস্থান আর থাকছে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েই চলেছে। মোদী সরকার কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থপূরণের লক্ষ্যেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রসঙ্গে নিশ্চুপ।

সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে কৃষকদের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পক্ষ থেকে সংসদ অভিযান সংগঠিত হলেও মোদী সরকার এই সমস্যা নিরসনে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা নিতে অনিচ্ছুক।

নজরদারির আন্তর্জাল

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

স্পাইওয়্যারের সাহায্যে বিরোধীদের ফোন হ্যাক করার অভিযোগ নিয়ে দেশ এখন উত্তাল। অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার কেবল বিরোধী দলের নেতাদেরই নয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী, এমনকি, বিচারকদের ওপরেও নজরদারি চালাতে নাকি এই স্পাইওয়্যার ব্যবহার করেছে। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে নজরদারির অভিযোগ নতুন নয়। ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় অভিযুক্তদের কমপিউটার হ্যাক করে তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর কথা উঠে এসেছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এন আই এ) নাকি এভাবেই তাঁদের ফাঁসাতে চাইছে। বিচারব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। স্ট্যান স্বামী হত্যার পর আপাত কিছু গণতান্ত্রিক কথা বললেও এই মামলায় সরকার, বিচারব্যবস্থা, বড় বড় মিডিয়া একই সুরে কথা বলে চলেছে। বরং বিচারের দীর্ঘসূত্রতার মধ্য দিয়ে অভিযুক্তদের ন্যায় বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

বিরোধী পক্ষের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ আমাদের দেশে নতুন নয়। শাসক দলের বদল হলেও, শাসনপদ্ধতি বদলায় না। সবই হয় দেশের নিরাপত্তার নাম করে। শাসক দলের স্বার্থ আর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেখানে সমর্থক। ফোন এভাবে হ্যাক করা আইনসম্মত কিনা তা নিয়ে চলছে বিতর্ক।

আইনসম্মত শব্দটা বড় গোলমেলে। আইনসম্মত হলেই তা নৈতিক এমন কোনো অর্থ নেই। আইনের নামে অনৈতিক কাজকে রাষ্ট্র বৈধতা দেয়। ভারতে ব্রিটিশ আমলের রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন থেকে শুরু করে স্বাধীন দেশের ইউ এ পি এ আইন ব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠরোধ করার ভুড়ি ভুড়ি দৃষ্টান্ত আমরা আজ মোদির শাসনকালে প্রত্যক্ষ করছি। আদালত এসব আইনের অপব্যবহার নিয়ে বহুবার সরকারকে ভৎর্সনাও করেছে। আজকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইনের যৌক্তিকতা নিয়ে সম্প্রতি আদালত প্রশ্নও তুলেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সরকার কানে দিয়েছে তুলো। আসলে দেশের প্রচলিত আইন, বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই রাষ্ট্র চরম স্বৈরাচারী হতে পারে। রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই রয়ে গেছে ফ্যাসিবাদী উপাদান। ইউ এ পি এ, আফস্পার মতো আইনের সুপ্রয়োগে (অপপ্রয়োগ কখনই নয়, কারণ এসব আইন রচিতই হয়েছে আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে) বেড়ে চলে রাষ্ট্রের নজরদারি। মোদি সরকার আইন, রীতিনীতির ফাঁকফোকরগুলো ব্যবহার করেই ফ্যাসিবাদের জমি মজবুত করছে।

রাষ্ট্রীয় নজরদারি

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে নাগরিকের ওপর নজরদারির জন্য রাষ্ট্রীয় আয়োজনের খামতি নেই। আমাদের গতিবিধির ওপর নিরন্তর নজরদারি চলছে। গত বছর করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার একটি অ্যাপ বাজারে নিয়ে আসে। তাতে যে করোনার মোকাবিলা হয় নি, তা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু সেই অ্যাপ ডাউনলোড করলে আমাদের যাতায়াতের ওপর নজরদারির ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও বাস্তবে সেই স্বীকৃতি মেলে নি। বরং প্রতিদিন আমাদের সেই অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

আধার কার্ড আবশ্যক নয়। অথচ ব্যবহারিক জীবনে এটি ছাড়া আমাদের কোনভাবেই চলবে না। কয়েক বছর আগে ঝাড়খন্ডে আধার কার্ডের জটিলতায় প্রেমারি কানোয়ার নামে এক বৃদ্ধার অনাহারে মৃত্যু হয়। স্টেট ব্যাঙ্কের একটি শাখায় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত করা হয়েছিল। সেই অ্যাকাউন্টে তাঁর বিধবা ভাতার মাসিক ছ'শো টাকা জমা হত। যেটা ছিল তাঁর একমাত্র উপার্জন। কিন্তু তাঁর ভাতার টাকা বাইশ কিলোমিটার দূরে সেই ব্যাঙ্কের অন্য শাখায় জমা হতে থাকে। তাও তাঁর নামে নয়। অ্যাকাউন্টটি ছিল অন্য এক মৃত ব্যক্তির নামে। সেই অ্যাকাউন্টটির সঙ্গে কীভাবে প্রেমারি দেবীর আধার নম্বর সংযুক্ত হয়ে যায়! রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভৌতিক কান্ড! দু'মাস বিধবা ভাতার টাকা না পেয়ে প্রেমারি দেবী মারা যান। তাঁর মৃত্যু অনাহারে না অপুষ্টিতে তা নিয়ে পন্ডিতদের তর্ক চলতে পারে। কিন্তু একে কি রাষ্ট্রীয় হত্যা বলা যাবে না? আধার কার্ড না থাকায় মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাও এদেশে ঘটে। আমাদের পার্লামেন্টে এসব নিয়ে ঝড় ওঠে না। সেখানে তো বিজেপি একচ্ছত্র।

এখন এক দেশ এক রেশন কার্ডের নামে আধার সংযোগ করতেই হবে। 'পরিযায়ী' শ্রমিকদের জন্য নাকি এমন ব্যবস্থা। শুনতে ভালো। আইন থাকা সত্ত্বেও পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য যে রাষ্ট্র রাখে না, সে সরকারের মন্ত্রী সংসদে বলতে পারেন যে, লকডাউনে বাড়ি ফিরতে গিয়ে কতজন শ্রমিক মারা গেছেন সরকার তা জানে না, সেই রাষ্ট্রের এত শ্রমিক দরদে সন্দেহ হয়।

রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগের নামে নজরদারির ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত হচ্ছে। এটা ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের (এন পি আর) একটা ধাপ। এন পি আরে নাগরিকের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করে আধারের সঙ্গে সেই তথ্য যাচাই করা হবে। অর্থাৎ আধার আবশ্যক। নাগরিকের যাবতীয় তথ্য চলে যাবে রাষ্ট্রের হাতের মুঠোয়। জনগণনার সঙ্গে ইচ্ছে করেই এন পি আরকে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এন পি আরের তথ্যের ভিত্তিতে এন আর সি তালিকা প্রস্তুত করা সহজ হবে। মতলব আসলে সকলের রেশন নয়, ধাপে ধাপে এন আর সি'র পথে এগোনো। রান্নার গ্যাসে ভর্তুকির নামে এমনই করা হয়েছিল। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ফোন ও আধার নম্বর সংযুক্ত আবশ্যিক করা হয়। সরাসরি ভর্তুকির টাকা ব্যাঙ্কে ঢুকবে। চুরি হবে না। শুনতে ভালো। কিন্তু ধীরে ধীরে ভর্তুকি গেল কমে। অদূর ভবিষ্যতে ভর্তুকি উঠে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ঘুরিয়ে আধার সংযোগ কার্যত বাধ্যতামূলক করে নজরদারির বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হল। আধার কার্ডের দক্ষযজ্ঞ শুরুর সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল এই কার্ডেই সব কাজ হয়ে যাবে। অন্য কিছু লাগবে না। এখন আবার নতুন পরিচয়পত্র।

যে আধার কার্ডের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হল, তা নাগরিকত্বেরও প্রমাণ নয়! সেদিনের শাসক দল আজ বিরোধী। সরকার বদলেছে। নীতি বদলায় নি। সাতে পাঁচে না থাকা ছাপোষা নাগরিক এসবে আপত্তির কিছু নাই দেখতে পারেন। কারণ তাঁরা 'রাজনীতি' করেন না। রাষ্ট্র যদি নজরদারি চালায়, আপত্তি কী? ভোট দিয়ে নাগরিকত্বের মহান দায়িত্ব পালন করলেই হল। রাষ্ট্রের প্রতিটি নির্দেশ, প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাকেই কর্তব্য বলে শেখানো হয়। অধিকার নাই বা থাকুক, কর্তব্য পালনেই আমাদের মুক্তি! কিন্তু রাষ্ট্র যখন দেশদ্রোহীর ভূমিকা পালন করে, দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ জারি রাখে, তখন তার বিরোধিতাও নাগরিকের কর্তব্য।

কর্পোরেট নজরদারি

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা রাষ্ট্রবাদী নাগরিকও ভাবে না, আরেক নজরদারির জালে আমরা কীভাবে জড়িয়ে পড়ছি। ইন্টারনেট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমাদের বিপুল তথ্যভাণ্ডার জমা পড়ছে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতে। রাষ্ট্রীয় নজরদারি নিয়ে হইচই হলেও, কর্পোরেট নজরদারি নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়। আন্তর্জালের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া যার সাম্রাজ্য। বলা হচ্ছে তথ্য নির্ভর সমাজ ধীরে ধীরে নজরদারি সমাজে পরিণত হতে চলেছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, খোদ রাষ্ট্রসংঘ ২০১৫ সালে এসবের মোকাবিলায় প্রাইভেট চিফের একটি পদ সৃষ্টি করে।

সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের ওপর কর্পোরেট নজরদারির বড় হাতিয়ার। আমরা কী ধরনের লেখা পড়ি বা লিখি, কোন ঘটনায় কী প্রতিক্রিয়া জানাই, কোন গান বা সিনেমা শুনতে/দেখতে পছন্দ করি সব সোশ্যাল মিডিয়া জানিয়ে দেয়। অনলাইনে খাদ্য থেকে শুরু করে নানা ভোগ্যপণ্য কেনা জানিয়ে দেয় আমাদের পছন্দ। অনলাইনে, বিভিন্ন কার্ডে বা ডিজিটাল লেনদেনে জিনিস কেনা, গান শোনা, সিনেমা দেখা শুরু করে অ্যাপ ক্যাবে যাতায়াতের তথাকথিত আধুনিকতা প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলে। আমাদের সেই তথ্যভাণ্ডার আজ পণ্য। আমাদের অন্ধকারে রেখেই যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা।

জেনেভার ক্র্যাকড ল্যাবস নামে একটি সংস্থা কয়েক বছর আগে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। নাম, কর্পোরেট সারভেলিয়েন্স ইন এভরিডে লাইফ। রিপোর্টে বলা হয়, টেলি পরিষেবা, মিডিয়া, ব্যাঙ্ক, বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, খুচরো ব্যবসা, অ্যাপ, ওয়েবসাইট প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির তথ্য পাচার হচ্ছে। বিপুল তথ্যভাণ্ডার জমা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির হাতে। পুঁজির কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে সঙ্গে চলছে ব্যক্তিগত তথ্যের কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি একজন ব্যক্তি কত অর্থ কোথা থেকে ধার নিয়েছেন, কতটা শোধ করেছেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা কেমন এসব তথ্য সংগ্রহ করে অন্য কোম্পানিকে বিক্রি করে। গোটা প্রক্রিয়া চলে বিভিন্ন কোম্পানির পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

২০২০ সালে বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি গ্রাহকদের তথ্য বেচে ৮০ লক্ষ কোটি ডলার আয় করেছে। গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইয়ের নামে ইকুইফ্যাক্স ৮২ কোটি গ্রাহকের জীবিকা, ফোন নম্বর, পরিবারের যাবতীয় তথ্য মজুত করেছে। আয়ার্ল্যান্ডে অনলাইনে পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবসা করা ট্রাস্টটেভ কোম্পানিকে ২০১৫ সালে ট্রান্সইউনিয়ন অধিগ্রহণ করে। ট্রান্সইউনিয়ন একটি ক্রেডিট রিপোর্টিং এজেন্সি। ট্রান্সটেভের তথ্য তারা ব্যবসার কাজে লাগায়। বিনি পয়সায় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে নানা মাধ্যম ব্যবহার করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাড়ের সুযোগ পেয়ে আহ্লাদে ভেবেও দেখি না কর্পোরেট নজরদারি কীভাবে আমাদের অন্দরমহলে থাবা বসিয়েছে।

গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই ও জালিয়াতি রোধের নামেও চলে তথ্য পাচার। জালিয়াতি রোধের বদলে খুলে যাচ্ছে জালিয়াতির নতুন নতুন পথ। আজ রাষ্ট্রের থেকে বেশি শক্তিধর কিছু কর্পোরেট সংস্থা। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের কর্মকান্ড, ইন্টারনেটে কী কী সার্চ করছি সেসব তথ্য সহজেই রাজনৈতিক নজরদারির সহায়ক হয়ে ওঠে। কেবল রাষ্ট্রই নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানের তথ্য পেয়ে যায়। আমাদের বায়োমেট্রিক তথ্য—আঙুলের ছাপ, মুখাবয়ব, হাঁটা চলার ধরন কোনো কিছুই আর গোপন থাকে না।

কয়েক বছর আগেই ভারতে একটি টেলিকম পরিষেবা কোম্পানি সিমের সঙ্গে আধার সংযোগের পর গ্রাহকের নামে তাদের পেমেন্টস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছিল। গ্রাহক জানতেও পারতেন না। অনেকের রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি সেই পেমেন্টস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার পর জানাজানি হয়। প্রায় ৩০ লক্ষ গ্রাহকের ভর্তুকির মোট ১৯০ কোটি টাকা তাদের ব্যাঙ্কে জমা হয়। মাত্র ৫ কোটি টাকা জরিমানা দিয়েই মুক্তি পায় সেই কোম্পানি। প্রশ্ন উঠেছিল যে, আধার কর্তৃপক্ষ ইউ আই ডি এ আই এবং ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এর দায় এড়াতে পারে না। অথচ, আধার সংযোগ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভর্তুকি, ডিজিটাল লেনদেন—সবই নাকি স্বচ্ছ ভারত গড়ার হাতিয়ার। আসলে রাষ্ট্র আর কর্পোরেট দুনিয়ার মেলবন্ধনে চলা নজরদারি ব্যবস্থা।

ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্যের নামে এভাবেই আমাদের সবকিছু বাজারি পণ্যে পরিণত হয়ে চলেছে। গোপন বলে আর কিছুই থাকে না। আমাদের জীবনযাপন, রুচিবোধ, সংস্কৃতি, মতাদর্শের নজরদারিতেই এরা থেমে থাকে না। সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও চালায়। কালক্রমে আমাদের অজান্তেই তারা এসবের নিয়ন্ত্রক হয়ে যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা কীভাবে কেড়ে নেওয়া হয় আমরা বাধ্য, সুবোধ নাগরিকরা ভাবতেই পারি না। ভোগবাদ ও ইন্টারনেটের মায়াজালে আমাদের ভাবার সময় ও পরিবেশই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের এক একান্ত ছাপোষা প্রতিক্রিয়া জানাতেও দ্বিধান্বিত সত্তায় পরিণত করা হচ্ছে। আমরা জীবন্মৃত হয়ে বিশ্বের কর্পোরেট কোম্পানিগুলির খাদ্যে অবনমিত হয়েই বেঁচে থাকতে বাধ্য হব।

খানাকুলে কম. কালাচাঁদ ব্যানার্জীর স্মরণসভা

আর এস পি'র পক্ষ থেকে গত ১৪ জুলাই কম. কালাচাঁদ ব্যানার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। আর এস পি হুগলী জেলা কমিটির সদস্য কম. কালাচাঁদ ব্যানার্জীর গত ৭ জুলাই জীবনাবসান হয়। খানাকুলের গোবিন্দপুরে অনুষ্ঠিত স্মরণসভার শুরুতে নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। স্মরণসভায় আর এস পি হুগলী জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত বলেন যে, গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কম. কালাচাঁদ ব্যানার্জীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সাংগঠনিক পরিকল্পনায় তাঁর নতুন চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে লোকাল স্তরে দলের জনভিত্তি গড়ে তোলার ওপর জোর দিতেন। পুঁজিবাদী উন্নয়নের বিকল্প মডেল মানুষের সামনে তুলে ধরার কথা বলতেন। কম. ব্যানার্জী অতি উৎসাহের সঙ্গে দলের নীতি আদর্শ চর্চা এবং বাস্তব কর্মসূচির মিলনকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কম. সেনগুপ্ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথে তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

আর এস পি জেলা কমিটির সদস্য তথা আর ওয়াই এফ জেলা সম্পাদক কম. বিপ্লব মজুমদার বলেন যে, খানাকুলের কমরেডদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি নানা কর্মসূচিতে খানাকুলে ছুটে এসেছেন। প্রত্যেক কমরেডকে আপন করে নিয়েছিলেন। এমনকি কমরেডদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানেও সচেষ্ট ছিলেন। প্রত্যেক কমরেড ছিল তাঁর আত্মজন। আর এস পি জেলা কমিটির সদস্য কম. ভবতোষ ঘোষ, আর ওয়াই এফ খানাকুল লোকাল সম্পাদক কম. ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন কম. অরুণ কাঁড়ার।

আর এস পি'র উদ্যোগে শ্রীরামপুরে আর্থিক সমীক্ষায় উঠে এল আর্থিক সঙ্কটের চিত্র

আর এস পি'র উদ্যোগে গত ১ থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে শ্রীরামপুরের ১০০টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা করা হয়। গত বছরের মার্চ মাস থেকে বিভিন্ন জীবিকায় যুক্ত মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি কেমন হয়েছে, কোন পরিবারের আয় কমেছে, জীবিকা বদলেছে, তাঁদের সামাজিক অবস্থার বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সময়কালে কী পরিবর্তন হয়েছে তাই ছিল সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। রেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবীমার, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুযোগ কারা কীভাবে পাচ্ছেন, অনলাইন ক্লাস নিয়ে অভিভাবকদের মতামত প্রভৃতিও সমীক্ষায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। কারখানার শ্রমিক, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গৃহশিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়েও এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে,

● অতিমারির প্রায় দেড় বছরে সিংহভাগ মানুষের আয় সাংঘাতিকভাবে কমেছে। কারখানার শ্রমিক, বেসরকারি কোম্পানির কর্মী থেকে পরিবহণ, নির্মাণ কর্মী এমনকি সাংস্কৃতিক কর্মী বা গৃহশিক্ষকদেরও অবস্থা করুণ।

● জীবিকা বদলের চিত্রটি স্পষ্ট হয় সব্জি বাজারে। দোকান কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক, অনুষ্ঠানবাড়িতে কাজ করা ব্যক্তিরা জীবিকা পালটে সবজি বেচছেন।

● সমীক্ষা করা পরিবারগুলির মধ্যে ২০ শতাংশ ডিজিটাল রেশন কার্ড না থাকায় রেশন পাচ্ছেন না। কোনোক্ষেত্রে একই পরিবারের কারোর ডিজিটাল কার্ড এসেছে, কারোর আসে নি। দুই বছরের বেশি আগে আবেদন করলেও অনেকে এখনও ডিজিটাল কার্ড হাতে পান নি। কারখানায় কাজ হারানো শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, জীবিকা পালটে বাজারে সরবত বেচে কোনোক্রমে টিকে থাকা হকার, ছোট সেলুনের কর্মচারী বা বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে বিগত দেড় বছরে আয় ৩০-৪০ শতাংশ কমে যাওয়া ব্যক্তিও রেশন পাচ্ছেন না।

● রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় আর কে এস ওয়াই ১ বা ২ রেশন কার্ড রয়েছে ৪৮ শতাংশের। গত বছর লকডাউনে আর কে এস ওয়াই ১ কার্ডে চাল, গমের বরাদ্দ বেড়েছিল। এবার তাদের চাল, গমের বরাদ্দ বাড়ে নি। নিয়ম অনুসারে গরিব মানুষের বেশি খাদ্যশস্য পাওয়ার কথা। কিন্তু ডিজিটাল রেশন কার্ডের কেরামতিতে বহু গরিব পরিবার কম খাদ্যশস্য পান। সমীক্ষাতেও সেই চিত্র ফুটে উঠেছে। দেখা গেছে গৃহ সহায়িকা, টোটো চালক, আয় হারিয়ে সঞ্চয়ের অর্থে দিন গুজরান করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আর কে এস ওয়াই ২ কার্ডে অতি সামান্য চাল, গম পেয়ে গভীর সঙ্কটে।

● পরিবারগুলির কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল রেশনে তেল, ডাল, চিনি, হলুদসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বাজার দর থেকে কম মূল্যে দেওয়ার দাবি তাঁরা করেন কিনা। সকলেই চান কেবল চাল, গম নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য রেশনে কম দামে দেওয়া হোক।

● সমীক্ষা করা ১০০টি পরিবারের মধ্যে ৬০ শতাংশ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পায় নি। ৪৪ শতাংশ কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন। আবেদন করেও না পেয়ে এই সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

● প্রায় ২৫ শতাংশ পেশা অনুসারে রাজ্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুযোগ পাওয়ার অধিকারী হলেও পান নি। রাজ্য সরকার কৌশলে সামাজিক সুরক্ষা যোজনাকে কার্যত শিকেয় তুলে দিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বহু নির্মাণ কর্মী, পরিবহণ শ্রমিক এই যোজনা সম্পর্কে কিছু জানেনই না।

● বেশ কয়েকটি পরিবারে মহিলারাই দেড় বছরের মধ্যে প্রধান উপার্জনকারী হয়েছেন। পুরুষের আয় কমেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার কোনো পরিবারে সঙ্কট মেটাতে গৃহবধূ গৃহ সহায়িকা বা অন্য কোনো পেশায় যুক্ত হয়েছেন। অনেকে আবার এই তথ্য জানাতে অস্বস্তিও পেয়েছেন। মহিলা প্রধান উপার্জনকারী বা অভাবে উপার্জনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন এই তথ্য তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাই এর অন্যতম কারণ। আবার কাজ হারানো মহিলাও রয়েছেন।

দেখা গেছে, কাপড়ের ছাপাখানার শ্রমিক কাজ হারিয়ে বাড়িতে চায়ের দোকান করেছেন। রোজগার কমেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। আবার কারোর পঞ্চাশ বছরেরও বেশি রমরমিয়ে চলা চায়ের দোকানের দৈনিক বিক্রি ৭০০-৮০০ টাকা থেকে কমে বর্তমানে হয়েছে ১০০ টাকা। কোনোদিন তারও কম। টোটোচালকের আয় থেকে ব্যাটারি চার্জ বা সারানোর খরচ বাদ দিয়ে থাকে না কিছুই। তবুও বাড়িতে বসে না থেকে রাস্তায় বের হওয়া। যেমন কিছুটা অভ্যাসে, কিছুটা আশা-নিরাশার দোলাচলে নিয়ম করে দোকান খোলেন হকার্স কর্নারের ছোট ব্যবসায়ী। সাইকেল গ্যারেজের কর্মী আগের থেকে সিকিভাগ রোজগারে মাগ্যি গন্ডার বাজারে বেঁচে থাকেন আরও পাঁচজনের সহায়তায়। গান গেয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বা নৃত্য শিখিয়ে জীবিকা উপার্জন করা সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও করুণ দশা। গত বছর থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ। প্রতিযোগিতার বিচারক বা কর্মশালা থেকে রোজগারও বন্ধ। ছাত্র-ছাত্রী কমেছে। এই সঙ্কটে তাই অনেকেই আরো কাছাকাছি এসেছেন, একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, পরীক্ষা অনিয়মিত তাই গৃহশিক্ষকদের অবস্থা করুণ। অনেকেই পড়ছে না। স্কুল বন্ধ বলে গাড়িতে করে আইসক্রিম বিক্রি করা ব্যক্তিটিরও পেটে টান। বিক্রি তলানিতে। দিনে ৭০০-৮০০ টাকার বিক্রি এখন ২০০ টাকায় নেমেছে। মানুষের আর্থিক সঙ্কটে আয় অর্ধেক হয়ে গেছে বাড়ি বাড়ি ঘি বিক্রি করা ব্যক্তির। ছোট সেলুনের মালিক কাম কর্মীর আয় অর্ধেকেরও বেশি কমেছে। তাঁর টোটোচালক ছেলেরও একই দশা। কারখানার ঠিকে শ্রমিকের মজুরি মাসে কমেছে ২০০০ টাকা। কর্মক্ষম ভাই কাজ হারিয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, অনলাইন ক্লাসে আর্থিক চাপ বাড়লেও অভিভাবকরা সন্তানদের কষ্ট করেও পড়াতে চান। সকলেরই মত অনলাইনে লেখাপড়া ঠিকমতো হয় না।

সমীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করতে শ্রীরামপুর পৌরসভার প্রশাসককে আর এস পি'র পক্ষ থেকে কম. শঙ্কর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি করা হয়,

১) শহরের প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা। উপার্জনহীনদের সাহায্যের পরিকল্পনা করা।

২) দ্রুত ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া। আর কে এস ওয়াই ১ ও ২ কার্ডেও বরাদ্দ বাড়ানো। সব কার্ডেই চাল, গম ছাড়াও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে সকলের পেটভরা পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা দেওয়া।

৩) আবেদনকারীদের দ্রুত স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেওয়া।

৪) সামাজিক সুরক্ষা যোজনার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালু করা ও মানুষকে সচেতন করার সঙ্গে এই প্রকল্পের ব্যাপক প্রচার করার।

ধর্মেন্দ্র প্রধান এখন শিক্ষাব্যবস্থা বরবাদ করতে উন্মুখ

ওড়িশার আর এস এস ঘনিষ্ঠ ধর্মেন্দ্র প্রধান বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অতি বিশ্বস্ত। মোদী সরকার গঠিত হবার পর থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বে। দীর্ঘকাল তিনি জ্বালানি মন্ত্রকের শীর্ষে থাকাকালীন দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোল, ডিজেল, কেরসিন তেল, রান্নার গ্যাসের মূল্য অস্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কোনকালেই জ্বালানি তেল এমন দুর্মূল্য হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যের খাড়ি অঞ্চলের দেশগুলিতে যখন যুদ্ধ দামামা বেজে উঠেছিল তখনও এমন অবস্থা হয়নি। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যখন আকাশচুম্বী হয়েছিল তখনও ভারতের রাজ্যগুলির কোথাও পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির বাজারদর বর্তমান সময়ের মতো লাগামছাড়া হয়নি।

সমগ্র দেশজুড়ে জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাস প্রভৃতির অস্বাভাবিক বা অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে, যে সময় সমস্ত জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন ভাবে বেড়েই চলেছে তখনও মোদীর হয়ে সাফাই গেয়ে গেছেন এই মন্ত্রীপ্রবর। তিনি নিতান্ত নির্লজ্জের মতোই দেশের কোভিড সংক্রমণ মোকাবিলায় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব লাঘবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সর্বৈব মিথ্যা পরিসংখ্যান প্রভৃতি পেশ করে মোদীর পর্বতপ্রমাণ অপদার্থতা আড়াল করার অপচেষ্টা চলেছে। বাজারদর কমানোর কোনও প্রচেষ্টাই যে কেন্দ্রীয় সরকার নেবে না, তাও স্পষ্ট হয়েছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্যে। স্বাধীন ভারতে জ্বালানি তেল মন্ত্রকের দায়িত্বে এত দীর্ঘকাল আর কোনও মন্ত্রী অধিষ্ঠান করেন নি। এটাও একটি রেকর্ড।

করোনার বীভৎস সংক্রমণকালে মোদী সরকার যখন সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক বোঝা চাপাতে তৎপর তখন আম্বানি-আদানিদের প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছে। কিছুদিন আগে মোদী মন্ত্রীসভায় রদবদল ঘটেছে। মোদীর অতি বিশিষ্ট আস্থাভাজন ধর্মেন্দ্র প্রধান পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হিসেবে চরম অপদার্থতার পরিচয় দেবার পরে এই ব্যক্তিটিকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার শীর্ষে বসানো হয়েছে। তিনি নতুন দায়িত্বে এসেই গত ১৯ জুলাই এক লিখিত প্রতিবেদন মারফৎ লোকসভায় জানিয়েছেন যে, দেশের প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষার বিশ্বমানের আই আই টি এবং এন আই টি গুলিতে শীর্ষ আধিকারিক বা ডিরেক্টরের ৩৯টি শূন্যপদ বেশ কিছুকাল যাবৎ পূরণ করা যাচ্ছে না। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৪৭ জন শিক্ষক পদ শূন্য হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় অরাজকতা বিরাজ করছে। সন্দেহ, আর এস এস ঘনিষ্ঠ কোনও শিক্ষিত আবেদনকারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি বলেই এমন অবস্থা।

ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও জানিয়েছেন যে, বর্তমানে আই আই টি'র ৮ জন এবং এন আই টি গুলিতে ২১ জন চেয়ারম্যানের পদ খালি রয়েছে।

এই মন্ত্রীপ্রবর আরও জানিয়েছেন, উজ্জয়িনীর মহর্ষি বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান মারফৎ ভারতের বৈদিক ঐতিহ্যগুলির বিশেষ প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা হচ্ছে। দেশের নয়টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যোগ বিদ্যা' সংক্রান্ত বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। বিদেশ থেকে যেসব বিদ্যার্থীরা ভারতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য আসেন তাঁদের বিশেষভাবে ভারত বিদ্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অতি দ্রুতবেগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় গৈরিকীকরণের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার প্রকল্পগুলি চলছে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের মত মোদী বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সেই কর্মসূচিকে আরও বেগবান করার জন্যই নির্বাচিত করা হয়েছে। জ্বালানি তেলের বাজারে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বর্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন যন্ত্রণার অবসান হয়তো আগামীদিনে প্রশমিত করা সম্ভব। কিন্তু সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপথচালিত করার এমন কুৎসিত কর্মসূচি যদি চলতেই থাকে তা আগামী বহু প্রজন্মকে সর্বনাশের মধ্যে ফেলে দেবে। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

কোভিড বিপর্যস্ত দেশ

১-এর পাতার পর

কোনক্রমে কর্মহীন না হলেও অর্ধেক বা তারও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। আপৎকালীন অবস্থায় অসহায় হয়ে বহু শ্রমিক কর্মচারী কোনক্রমে বেঁচে আছেন। আশঙ্কা হয়, কম মজুরিতে কাজ করার আপাতত যে বাধ্যবাধকতা তা-ই হয়তো আগামীদিনে স্থায়ী রূপ নেবে। সমস্ত জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া বেড়ে যাবে আর মানুষের ন্যায্য পথে উপার্জনের সুযোগ ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়বে। এমন এক সুগভীর আশঙ্কা সর্বব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে।

চরম হতাশা থেকে সামাজিক ভারসাম্য ক্রমাগত বিধ্বস্ত হয়ে চলেছে। বহুক্ষেত্রেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে, অনেক মধ্য আয়ের উপার্জনশীল মানুষ অসহায় অবস্থায় সপরিবারে আত্মঘাতী হচ্ছেন। নারীসমাজ সর্বতোভাবে অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদ্ধ। সংসারগুলির অভাব সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে মহিলাদের। স্বামী সন্তান বা পরিবারের অন্যদের অন্ন দেবার দায়িত্ব তো তাঁরাই বহন করেন। অনৈতিক অসহায়ত্বে গৃহ অশান্তি বাড়িয়েই চলেছে। সামাজিক অপরাধ বিশেষ করে যৌন অপরাধ এক লজ্জাজনক উর্ধমুখী বাস্তবতায় পরিণত। এসব থেকে পরিত্রাণের পথে বলিষ্ঠ ধারাবাহিক গণআন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই।

গণবার্তার উদ্যোগে ড. অরবিন্দ পোদ্দারের স্মরণসভা

গত ২৪ জুলাই গণবার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রখ্যাত মার্কসবাদী চিন্তক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী ড. অরবিন্দ পোদ্দারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রান্তি প্রেসের লোকায়ত সভাগৃহে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন প্রলয় চৌধুরী। স্মরণসভায় রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কম. বিমান বসু বলেন যে, ড. অরবিন্দ পোদ্দার ছিলেন সমাজ পরিবর্তনের সৈনিক। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী হিসেবে সমাজ বদলের যে ভাবনায় তিনি জাড়িত হয়েছিলেন, আজীবন সেই মতাদর্শে স্থিত ছিলেন। বাংলার নবজাগরণকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। নবজাগরণ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ প্রখ্যাত চিন্তক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের সমতুল ছিল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতেই তিনি নবজাগরণের মূল্যায়ন করেছিলেন। ইউরোপীয় রেনেশাঁর সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেছিলেন।

রাজনীতিতে মার্কসবাদী মতাদর্শ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর বৌদ্ধিক চর্চা সকলের কাছেই শিক্ষনীয়। বুদ্ধিজীবি হিসেবে তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা কখনই ভুলে যান নি। তিনি ড. পোদ্দারের রবীন্দ্র মানস, বঙ্কিম মানসসহ বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ করেন। কম. বিমান বসু বলেন যে, বর্তমানে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি সমাজকে কলুষিত করছে। ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামে ড. অরবিন্দ পোদ্দারের অমূল্য প্রবন্ধগুলি বড় হাতিয়ার। যেসব মার্কসবাদী মাঠে ঘাটে রাজনৈতিক সংগ্রাম করে চলেছেন, তাঁদের ড. পোদ্দারের ভাবনা থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি ড. অরবিন্দ পোদ্দারের মূল্যবান প্রবন্ধগুলি নিয়ে সংকলন প্রকাশের প্রস্তাব দেন।

ড. তুষার চক্রবর্তী স্মরণসভায় ড. অরবিন্দ পোদ্দারের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন যে, আজীবন ড. পোদ্দার সেই বিপ্লবী মতাদর্শকেই পাথেয় করেছেন। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের জীবনচর্যার উল্লেখ করে বলেন যে, ড. পোদ্দারের বৌদ্ধিক চর্চা সেই পথ থেকে কোনোদিনই বিচ্যুত হয় নি। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি যেমন নবজাগরণের মূল্যায়ন করেছেন, তেমন রবীন্দ্রসাহিত্য, বঙ্কিম সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ড. পোদ্দারের সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব, বাংলার অগ্নিযুগ, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেন।

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের সঙ্গে গান্ধীজির মতের অমিল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির অবদান স্বীকার করতে ড. অরবিন্দ পোদ্দার দ্বিধাবোধ করেন নি। এবিষয়ে বিপ্লবী সমাজবাদের আদর্শে দীক্ষিত ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, দুজনেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গান্ধীজির মূল্যায়ন করেছিলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায়, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও ড. তুষার চক্রবর্তী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, গ্রামশি অর্গানিক, পাবলিক ও রেভোলিউশনারি ইন্টেলেকচুয়ালদের কথা বলেছিলেন। ড. অরবিন্দ পোদ্দার ছিলেন এই তিন ধরনের বুদ্ধিজীবীর অনন্য মিশ্রণ। তাঁর বৌদ্ধিক চর্চা কখনই সমাজ বিচ্যুত শৌখিন মজদুরি ছিল না। যে চর্চার কেন্দ্রে রয়েছে মানব সমাজ এবং বিপ্লবী মতাদর্শ। সেকারণেই মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে তিনি চিরকালই শিক্ষনীয়। ড. অরবিন্দ পোদ্দারের পুত্র অমিতাভ পোদ্দার তাঁর স্মৃতিচারণ করেন।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন গণবার্তা পত্রিকার সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি. ড. পোদ্দারের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সাম্প্রতিক রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রখর স্মৃতি এবং ইতিহাস বোধ সমন্বিত মার্কসবাদী দৃষ্টিতে প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ করতেন। বামপন্থীদের সঙ্কটে তিনি উদ্বিগ্ন হতেন। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের নীতিনিষ্ঠ জীবন যাপন থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত হন নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর গবেষণার ইতিহাস, কমিউনিস্ট বলে তাঁকে অধ্যাপকের চাকরি না পাওয়ার ঘটনার উল্লেখ করে কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন যে, মতাদর্শের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর জীবনচর্যা খুব কাছ থেকে লক্ষ করার সুযোগ আমাদের কয়েকজনের হয়েছে। তিনি আজীবন একান্ত অনাড়ম্বর ও বাহল্যবর্জিত জীবনাচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। কিশোর বয়সে অনুশীলন বিপ্লবীদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং দীর্ঘ বছরের ইংরেজদের কারাগারে বন্দি থাকার ফলে নির্দিষ্ট শৃংখলা বোধ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আজীবন তা থেকে বিচ্যুত হননি। সুস্থ জীবন যাপনে যা করা বিজ্ঞানসম্মত তাই তিনি করে গেছেন।

শতোত্তীর্ণ এই মানুষটি শেষের কয়েকবছর আক্ষেপ করতেন যে তিনি দলের, সমাজের বা দেশের কোনও কাজেই যুক্ত থাকতে পারছেন না। অতএব এত দীর্ঘজীবন অনাবশ্যক বোঝা স্বরূপ।

ক্রান্তি, গণবার্তাসহ বিভিন্ন পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর অবদানের কথা তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, গণবার্তার পক্ষ থেকে তাঁর নামে একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর তাঁর নামে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে।

স্মরণসভায় গৃহীত প্রস্তাব

বিদগ্ধ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ, বিপ্লবী ধারায় তন্নিষ্ঠ আপসহীন এক স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং গণবার্তার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম অরবিন্দ পোদ্দার গত ২০ জুন প্রয়াত হয়েছেন। আমাদের সকলের জন্য তিনি একশ বছরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন। জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশবিদেশের আর্থসামাজিক তথা সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অদম্য প্রাণশক্তি ও উন্নত রসবোধ ছিল তাঁর জীবনচর্যার আন্তর সম্পদ।

নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা, বাংলার নবজাগরণের বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিহাস-নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের পুনর্নির্মাণ বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পরিসরে বিদ্বজ্জনদের মাঝে তাঁর অনন্য অবস্থানটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য এবং আমন্ত্রণ তিনি অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে দায়বদ্ধ সমাজবদলের প্রত্যাশীর মতো নিজ আদর্শে স্থিত হয়েই ঘোষণা করেন যে, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মতো ব্যবহৃত হতে তিনি সম্মত নন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ব্যক্তিক উদ্যোগহীন মৌমাছির সমাজতন্ত্রেরও ঘোর বিরোধী তাঁর মার্কসবাদী বীক্ষণের সমগ্র জীবনপর্বে। আপন সত্তায়, আপন মহিমায় মানব-অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়াই ছিল তাঁর একান্ত আন্তরিক অভীপ্সা।

অরবিন্দ পোদ্দারের গবেষণা মূলক গ্রন্থসমূহ যথা—বঙ্কিমমানস, রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সিমলা রিসার্চ ইন্সটিটিউটে গবেষণাকালে Renaissance in Bengal, Quests and Confrontation এবং Renaissance in Bengal, Search and Identity প্রভৃতিতে বাংলা তথা ভারতের বৌদ্ধিক নবজাগরণের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ইতিহাস চর্চার অমূল্য নিদর্শন। রেনেসাঁসের পথিকৃতদের তিনি ঔপনিবেশিক যুগ এবং তাঁদের শ্রেণি অবস্থানের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। নবজাগরণের ধারাবাহিকতার সূত্রেই তিনি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সার্থকতা ও ব্যর্থতার বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা করেছেন।

নিতান্ত কৈশোরে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসে যে সশস্ত্র সমাজবিপ্লবের আদর্শে অরবিন্দ পোদ্দার দীক্ষিত হয়েছিলেন, যুব বয়সে সুদীর্ঘ কারাবাসকালে তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণে জারিত হয়ে তাঁর চেতনাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে প্রত্যয়ী করে। তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন, ১৯৪০ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে বহু বিপ্লবী তরুণকে আনা হয় দমদম সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে বিশ্বযুদ্ধের গুণগত চরিত্র, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ঘোর তর্কবিতর্ক হত। দীর্ঘ কারাবাসকালে সুখময় চক্রবর্তী, কুমুদ দাশগুপ্ত প্রমুখর সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। কারাবাসকালে তিনি বিপ্লবী নরেন সেন, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন।

প্রবীন বিপ্লবীদের দুঃসাহস, আত্মত্যাগ অরবিন্দ পোদ্দারের সহযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা সত্ত্বেও সেই সব পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবকদল অনুভব করেছিলেন যে বৈপ্লবিক ভাবাদর্শগত সত্তা প্রত্যয়ের গভীরে চালিত হওয়া প্রয়োজন। সেই শূন্যতা পূরণের অন্তহীন তাগিদেই তাঁদের গভীরভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদ চর্চা। তাঁর সুগভীর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রজ্ঞাই পরবর্তীতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে চিরায়ত মার্কসবাদী ধারায় বাংলার নবজাগরণের অনন্য চর্চা। কারাবাসের অবসানে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ধারার চিন্তক সতীশ সরকার, তারাপদ লাহিড়ী, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখের সংস্পর্শে এসে স্বতন্ত্রধারার মার্কসবাদী দল আর এস পি'র রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হন অরবিন্দ পোদ্দার। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে এঁরা সবাই প্রত্যক্ষভাবে আর এস পি'র সঙ্গে যুক্ত হন। স্বাধীনতা লাভের পর ননী ভট্টাচার্য, মোজাম্মেল হক, সুখময় চক্রবর্তী প্রমুখর সঙ্গে দৈনিক গণবার্তা প্রকাশের দায়িত্ব নেন।

পরবর্তীতে দলের ক্রান্তি, ছাত্র, যুবকণ্ঠ, সাপ্তাহিক গণবার্তা সহ প্রতিটি পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রগতিশীল প্রকাশনা সংস্থা লেখক সমবায় সমিতি, ইন্ডিয়ানা, প্রত্যয় প্রভৃতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুচেতনাবোধ এবং বিপ্লবী দায়বদ্ধতা এক সহযোদ্ধা সুলভ বন্ধনের টানে আকর্ষণ করত অরবিন্দ পোদ্দারকে। এই তাগিদ থেকেই তিনি সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিগত সত্তরের দশকে রাজনৈতিক হানাহানি ও অবক্ষয়ের অবসানের লক্ষ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে একত্রে সংগঠিত করেন সংস্কৃতি পরিষদ। ১৯৭০ সালে মহাজাতি সদনে তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্বে যাত্রা শুরু হয় এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের।

একথা সত্য যে, সুদীর্ঘ জীবনের উপান্তে এসে তিনিও দেখে গেছেন অতলস্পর্শী পুঁজিবাদী সংকট সত্ত্বেও বিশ্বায়নের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও দাপট। প্রতিক্রিয়ার পুনরুত্থান ও হৃদয়ের সংবেদনশীলতা হরণ, বেকারত্ব ক্ষুধা মৃত্যু সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিচিতি সত্তার হানাহানি। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা গণ আন্দোলন, শ্রেণি আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধছে না। এ রাজ্যে বামপন্থীদের হীনবল অবস্থা এবং দুটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাব বৃদ্ধিতে তিনি কিছুটা আশঙ্কিতও ছিলেন। তথাপি চিরজাগ্রত সংগ্রামী স্পৃহা তাড়িত হয়েই সন্ধান করতেন লাতিন আমেরিকা সহ নানা দেশে সংগ্রামের ঘটনা ও সামাজিক আন্দোলনের গতিবিধি। সমস্ত হতাশাকে চূর্ণ করে রোমা রোলাঁ, সার্ত্র, লুকাস প্রমুখ দায়বদ্ধ সমাজবদলের চেতনাঋদ্ধ বিদ্বজ্জনের মতো অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর বলিষ্ঠ সুহৃদ ও আপনজন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে আহ্বান করেন। বৈপ্লবিক চেতনায় দধীচির প্রতিশ্রুতিতে উদ্বুদ্ধ করেন এই অমানিশার কালে, "প্রতিদিন তোমার জন্মদিন মৃত্যুকে পার হয়ে যাওয়ার জন্য,
তোমার বিষণ্ণতাকে পার হয়ে যাওয়ার জন্য,
এক নতুন জন্মের প্রতীক্ষা যা তোমার...
তোমার স্বপ্নের... তোমার মন্ত্রের পরিপূর্ণতা।
নিজেকে কঠিন করো!
তুমি হাঁটো!
সামনে...যতদূর চোখ যায়।

এই সভা বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দারকে স্মরণ করে তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত বৃহত্তর পরিবারের সকলের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে। একই সঙ্গে তাঁর অমলিন স্মৃতি আগামীদিনে জাগরুক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

—গণবার্তা পত্রিকার পক্ষে
২৪ জুলাই ২০২১

বলাগড়ে কম. হরেন বিশ্বাসের মৃত্যুদিবস পালন

বিগত বছরগুলির মতো এবছরেও বলাগড়ে আর এস পি'র প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক কম. হরেন বিশ্বাসের মৃত্যুদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। গত ১৮ জুলাই বলাগড়ের কৃষ্ণবাটিচরে শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি হুগলী জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. সত্যজিত দাশগুপ্ত, কম. শুভাশিস সিনহা, জেলা কমিটির সদস্য কম. কমল রায়, কম. সন্তোষ সরকার, কম. সত্যজিত মাহাতো প্রমুখ।

দলের পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার প্রবীণ নেতা কম. সহদেব মাহাতো। আর এস পি জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত কম. নবগোপাল ঘোষের স্মরণসভাও একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ ও পরিবারের সদস্যরা কম. হরেন বিশ্বাস ও কম. নবগোপাল ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সভায় নেতৃবৃন্দ কম. হরেন বিশ্বাসের কৃষক আন্দোলনে অবদানের কথা উল্লেখ করেন। গ্রামে বিদ্যালয় গড়ে তুলতে তাঁর ভূমিকারও উল্লেখ করা হয়। কম. নবগোপাল ঘোষের রাজনৈতিক জীবনেরও স্মৃতিচারণ করা হয়।

কোভিড-১৯ সংক্রমণে বিধ্বস্ত ভারতের সাধারণ জনসমাজ

লাগামছাড়া মুনাফা কেন্দ্রিক বেসরকারি ব্যবসা নির্ভর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বহু সহস্র দরিদ্র মানুষকে নিঃস্ব করে চলেছে—ভয়ঙ্কর কোভিড সংক্রমণ থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় বা অধিকাংশ রাজ্য সরকারের চিকিৎসা ব্যবস্থা চরম অপ্রতুল। গ্রামীণ ভারতে, যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস, সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা এক করুণ অবস্থায় পতিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্ত মানুষের চিকিৎসার সুযোগই নেই। মানুষের মধ্যে বাঁচার জন্য হাহাকার চলছে। কোথাও হাসপাতালের ভঙ্গুর প্রায় আয়োজন থাকলেও চিকিৎসক নেই, নার্স নেই বা অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীও নেই। গ্রামীণ মানুষ বাধ্য হচ্ছেন প্রাণের দায়ে শহরগুলিতে পৌঁছে শেষ চেষ্টা করতে। পারিবারিক সম্পদ যতটুকু আছে, বিক্রি করে বেপরোয়া মানসিকতায় শহরে পৌঁছে যেতে হচ্ছে।

শহরগুলিতেও চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রয়োজনের তুলনায় বড়ই কম। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থা। বেপরোয়া হয়ে আর্ত মানুষ ছুটছেন বেসরকারি নার্সিংহোম কিংবা হাসপাতালগুলিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক সামর্থ্য সম্পর্কে সামান্যতম সংবেদনশীল অনুভূতি পর্যন্ত এই সব বেসরকারি ব্যবসায়ীদের নেই। বেশীর ভাগ বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা চিকিৎসা শুরু করার আগেই বিশাল পরিমাণে অর্থ আগাম জমা করতে বাধ্য করছে। চিকিৎসা চলাকালীন প্রতিনিয়ত জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে ব্যয়। নিরুপায় মানুষ কোথা থেকে অর্থের সংস্থান করবে তা নিয়ে স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের ন্যূনতম ভাবনাও নেই। এরা হাঙ্গর সদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ করে চলেছে।

সামর্থ্য বহির্ভূত চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে সারা দেশে ইতিমধ্যে কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে গেছেন। ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে, ভারতের রাজ্যগুলিতে সাধারণের চিকিৎসা ব্যয়ের অতিসামান্য অংশ রাজ্য সরকারগুলি ব্যয় করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে হিন্দি বলয়ের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের মাত্র ১.৫ শতাংশ সরকার বহন করে। বিহারে অবস্থাটি আরও সঙ্গীন। প্রতি একশ টাকা ব্যয়ে বিহার সরকারের মাত্র দশ পয়সা বরাদ্দ। অন্যান্য রাজ্যগুলির অবস্থাও তথৈবচ। মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি'র তুলনা জনস্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ অস্বাভাবিক কম।

বিহার উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থা যথার্থই বিপর্যস্ত। স্বাভাবিক কারণেই এই সব রাজ্যে ব্যক্তিগত স্তরে বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের ক্ষমতা না থাকলে কোভিড সংক্রমিত মানুষ অসহায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। মৃত শবগুলি হাজারে হাজারে বহমান নদীগুলিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা ব্যয়ে সংকুলান করে আর শবদেহ সৎকারের প্রয়োজনীয় অর্থ থাকবে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিন্দুকরা বলেছেন যে সরকার মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করতেই নদীর জলে শব ভাসিয়ে দিয়েছে।

বিশেষ দশটি দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে তুলনা করলে দেখা যায় যে, রোগীর পারিবারিক ব্যয় ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশি। কোভিড সংক্রমিত ভারতে প্রায় ৩ কোটি আট লক্ষ সত্তর হাজার মানুষ। এই মানুষগুলির মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ৬২.৭ শতাংশ নিজেদের পারিবারিক ব্যয়। তুলনায় রাশিয়ায় ৫০ লক্ষ ১ হাজার মানুষ সংক্রমিত। তাঁদের নিজস্ব খরচ ৩৮.৩ শতাংশ। লাতিন আমেরিকার অন্যতম বড় রাষ্ট্র আর্জেন্টিনায় সংক্রমিত ৩ লক্ষের বেশি। ব্যয় বহন করছে মাত্র ২৭.৭ শতাংশ। ব্রাজিলের মতো একটি বিশাল দেশ যেখানে বিগত কিছুকাল যাবৎ জায়ের বোলসোনারোর মতো এক চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বৈরশাসক রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছেন সেখানেও মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ২৭.৫ শতাংশ ব্যক্তিগত। ইটালীতে আরও কম ২৩.৬ শতাংশ।

তুরস্ক বা টার্কি বহুকাল যাবৎ এক ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি রিসেপ তোয়ের এরদোগান শাসন ক্ষমতায়। ওই দেশেও বহুসংখ্যক মানুষ কোভিড সংক্রমিত। কিন্তু চিকিৎসা ব্যয়ের মাত্র সাড়ে সতেরো শতাংশ রোগীদের বহন করতে হচ্ছে। ইংলন্ড এর চিকিৎসা ব্যবস্থা বেশ উন্নত। ওই দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বহু হতদরিদ্র মানুষও উন্নত চিকিৎসা লাভ করছেন। ওই দেশে মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের মাত্র ১৬.৭ শতাংশ ব্যক্তিগত স্তরে ব্যয় হচ্ছে জার্মানীতে ১২.৭ শতাংশ, ফ্রান্সে মাত্র ৯.৩ শতাংশ। এসব ভাবলে আমাদের হতাশ হতে হয়।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মায়ানমারে ৭৬.৫ শতাংশ ব্যয় বহন করছে অসুস্থ মানুষ, বাংলাদেশে ৭৩.৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ৫৬.২ শতাংশ, নেপাল ৫০.৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কা ৫০.৭, চিন ৩৫.৮ এবং ভুটান মাত্র ১৩.২ শতাংশ। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ৫৬ ইঞ্চি শাসিত ভারতের অবস্থান যথার্থই লজ্জাজনক।

ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে বিহার রাজ্যে প্রায় একশ শতাংশ ব্যয় রোগগ্রস্তদেরই করতে হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে ৯৮.৫, মধ্যপ্রদেশে ৯৭.৯, তামিলনাড়ু ৯৭.৫, মহারাষ্ট্রে ৯৭.৫, রাজস্থান ৯৭.১, ঝাড়খন্ড ৯৫.৮, তেলেঙ্গানা ৯৫.৭, পশ্চিমবঙ্গ ৯৫.৭ এবং আসাম রাজ্যে ৯৫.৩ শতাংশ ব্যয়িত হচ্ছে। এসবই জনসংখ্যার অনুপাত।

ভারতের বিভিন্ন শহরাঞ্চলেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিহারের অবস্থান সর্বনিম্নে। অতি স্বাভাবিক কারণেই ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষ সরকারের পরিকল্পিত উদাসীনতায় প্রাণ বাঁচাতে দ্রুত দারিদ্রের অভিশাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মোদী সরকারের বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত বিজ্ঞাপনগুলি ভারতের সাধারণ জনজীবনে এক চূড়ান্ত রসিকতায় পরিণত।

ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা চরম বিপর্যয় করোনাকালে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। নীচের সারণির দিকে লক্ষ করলেই মূল সমস্যার কারণটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। জিডিপির অনুপাতের এই পরিসংখ্যান প্রদত্ত হল—

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়		শিক্ষাখাতে ব্যয়	
জাপান	৯.২%	ভূটান	৬.৯%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮.৫%	দক্ষিণ আফ্রিকা	৬.৫%
ইংলন্ড	৭.৯%	ব্রাজিল	৬.৩%
বিশ্ব গড়	**৫.৯%**	ইংলন্ড	৫.৪%
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪.৫%	নেপাল	৫.১%
ব্রাজিল	৪.০%	রাশিয়া	৪.৭%
রাশিয়া	৩.২%	**বিশ্ব গড়**	**৪.৫%**
চিন	৩.০%	মালয়েশিয়া	৪.২%
থাইল্যান্ড	২.৯%	ভিয়েতনাম	৪.২%
ভিয়েতনাম	২.৭%	ইতালি	৪.০%
ভুটান	২.৪%	চিন	৩.৫%
মালয়েশিয়া	১.৯%	ভারত	৩.৫%
শ্রীলঙ্কা	১.৫%	জাপান	৩.২%
নেপাল	১.৫%	পাকিস্তান	২.৯%
পাকিস্তান	১.১%	শ্রীলঙ্কা	২.১%
ভারত	১.০%	বাংলাদেশ	১.৩%
বাংলাদেশ	০.৪%		

(বিশ্ব ব্যাংক পরিসংখ্যান। ভারতের ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতে ব্যয় ২০২০-২১ এর সরকারের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত।) এই হিসাবে মোদী সরকারের তথ্য কারচুপির বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। মোদীর শাসনকালে এমন তথ্য বিকৃতি বহুবার লক্ষ্য করা গেছে। এমনকী, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার কলাফলকেও সরকারের সুবিধামত পরিবর্তন করা হয়েছে।

মোদী সরকারের অপকীর্তির শেষ নেই

এই সময়কালে দেশের প্রায় সবকটি রাজ্যেই পেট্রোলের দাম লিটারে একশ টাকা পেরিয়ে গেছে। মুম্বাই ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দাম বাড়ানো হয়েছে যথাক্রমে পেট্রোলে ১১.৬০ টাকা এবং ডিজেলে ১২.৪০ টাকা। ২০২১ সালের শুরু থেকেই এমন দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। মোদি সরকারের সুচিন্তিত পদক্ষেপ! অতিমারির প্রকোপ সামলাতে সরকারের কোষাগারের ওপর চাপ কমাতেই নাকি এমন চূড়ান্ত জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এটা এক নির্জলা মিথ্যা এবং দেশের মানুষের সঙ্গে চরম প্রতারণা।

এই মন্ত্রীপ্রবর বেশ জোরালো কণ্ঠেই জানাচ্ছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কোভিড-সংক্রমণ রোধ করতে যে ব্যয় করছে তার একটি অংশ এভাবেই উদ্ধার করা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পেট্রোপণ্যের দাম এভাবেই বেড়ে যাবে। আগামীদিনে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১২৫-১৩০ টাকা বৃদ্ধি পাবে। ডিজেলের ক্ষেত্রেও তথৈবচ। ঔদ্ধত্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে মোদি সরকার। মানুষকে আগে থেকেই সন্ত্রস্ত করে রাখা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ২০২১ সালের শুরু থেকেই অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা উর্দ্ধমুখী। আমদানি করার উপযুক্ত 'ব্রেন্ট' অয়েলের দাম বেড়েছে ৩৭.১ শতাংশ। ব্যারেল প্রতি ৫১.৮ ডলার থেকে ৭১ ডলার হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না ২০১৪-র আর্থিক বছরে অপরিশোধিত জ্বালানির দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১০৫.৫ ডলার। সেই সময়েও খুচরো বাজারে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বর্তমান সময়ের অনেক কম ছিল। গত ২০১৩ সালের জুন মাসে যখন, আমদানি করা অপরিশোধিত জ্বালানির দাম ব্যারেল প্রতি ১০১ ডলার পড়লেও ভারতে লিটার পিছু পেট্রোল প্রাথমিকভাবে ৬৩.০৯ টাকা এবং সাধারণ ক্ষয়ক্ষতি সামলে বাজারে দাম ছিল ৭৬.৬০ টাকা। ডলার মূল্যের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যও এই হিসেবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে যে, সেই সময় বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী আদানি-আম্বানির টাকায় সারা দেশে ঘুরে ঘুরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে গেছেন। তিনি অতি উচ্চকিত কণ্ঠে দাবি করেছিলেন যে, পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৩৫ টাকার বেশি হবার কোন কারণ নেই। মোদীর সঙ্গেই গলা মিলিয়ে অন্যান্য বিজেপি নেতারাও একই কথা সোচ্চারে বলে গেছেন। দেশের মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা মোদীর অন্যতম চারিত্র বৈশিষ্ট্য। নতুন করে এ বিষয়টি উল্লেখ না করলেও চলে।

আমরা জানি যে, পেট্রোলের মূল্য বিনিয়ন্ত্রিত হয়েছিল ২০১০ সালে এবং মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরেই ডিজেলের ক্ষেত্রেও বিনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। একইভাবে লক্ষ করা যায় যে, ২০১৮ সালে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় কমে দাঁড়ায় ব্যারেল প্রতি ৮০.১ ডলার, অথচ ডিজেলের খুচরো মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় লিটার প্রতি ৭৫.৭০ টাকা। মোদী জমানার প্রথম পর্বে আন্তর্জাতিক স্তরে জ্বালানি তেলের বাজারে ধস্ নামে। মোদী সরকার তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে প্রচুর অর্থ কোষাগারে জমা করেছিল।

যে সময় পেট্রোল, ডিজেলের দাম সরকার সরাসরি নির্ধারণ করতো তখন, একটি ফান্ড তৈরি করা হয়েছিল, যা থেকে দুঃসময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ভরতুকি দিয়ে বাজার দরে ভারসাম্য বজায় রাখা হত। ১৯৯৮-৯৯ সালে বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার পূর্বে চালু প্রশাসনিক দায়িত্বে পেট্রোল-ডিজেল ইত্যাদির দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে দাম বাড়বে-কমবে এমন এক পদ্ধতি স্থির করে। APM —থেকে PPM ই (Administrative Price Mechanism—Price Parity Mechanism) সর্বনাশের সূত্রপাত। মুক্ত বাজারের নৈরাজ্য এবং চরম অরাজকতা ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। ধারাবাহিকভাবে দেশের মানুষ চরম ক্ষতির মুখে।

পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেল, রান্নার গ্যাস সবই লাগামছাড়া দামে বিকোচ্ছে। এর কুপ্রভাবে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম চূড়ান্তভাবে উর্ধমুখী। সবকিছুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। মানুষ অসহায় অবস্থায় দিনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। ঔদ্ধত্যের চরমসীমা অতিক্রম করে গেছে এই সরকার।

তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির পরিবর্ত নয়

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্টতই তৃণমূল কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিপুল জয় হাসিল করেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, এই দলটির একমাত্র সত্ত্বাধিকারী বা মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে হেরেছেন। তিনি একদা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে যে লড়াই করেছিলেন, সেই নন্দীগ্রাম থেকেই পরাজিত হয়েছেন। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে নি! তিনি পরাজিত হলেও জয়ী দলের সর্বেসর্বা তো তিনিই। অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করবেন তা, ভাবাই যায় না।

এবারের ভোটপর্বে প্রথম থেকেই রাজ্যের এগিয়ে থাকা সংবাদ মাধ্যমগুলি বেশ জমিয়ে একটা 'বাইনারি' বা দ্বিপক্ষীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিটোল গল্প রাত্রিদিন পরিবেশন করে গেছে। ঈর্ষনীয় উচ্ছ্বাস এবং অপযুক্তির অবতারণা করে এই সব গণমাধ্যমগুলি বাংলার ঘরে ঘরে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস আর নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ'র ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যেই যে কোন একটি আগামী দিনে বাংলার শাসনের হকদার হবে। অন্য কেউ নেই।

এই রাজ্যে দীর্ঘকাল মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বামপন্থীদের মিডিয়ার উচ্চকিত প্রচারে খুঁজে পাওয়াই যায় নি। সে সব উজ্জ্বল ঐতিহ্য পরিকল্পিতভাবেই হারিয়ে ফেলা হচ্ছে। অতএব, রাজ্যের জন পরিসরে শত চেষ্টা করেও বাম দলগুলির ভোটের আগে হারিয়ে যাওয়া আটকানো যায় নি। পরে অবশ্য ভালভাবেই বোঝা গেল যে, বহু অর্থ ব্যয় করেই দুটি রাজনৈতিক দল ওই ব্যবস্থাটি পাকাপাকিভাবে করেছে। সেই 'মানি পাওয়ার' বা অর্থবলের প্রগলভ প্রকাশ। এমন বিপুল খরচসাপেক্ষ প্রচার সকলের জন্য নয়। ফেল কড়ি, মাখো তেল! বামপন্থীরা তো প্রথম পর্বেই বিলকুল ফেল্টু। প্রচলিত গণতন্ত্রের অপার মহিমা।

একথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে ভারতের সর্বাপেক্ষা ধনী রাজনৈতিক দল এখন বিজেপি। তাদের অফুরন্ত টাকা। নরেন্দ্র মোদীর সরকার বেশ কিছুকাল আগেই 'ইলেক্টরাল বন্ড' চালু করেছে। বড় বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা জনসমক্ষে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে তাদের পছন্দমত দলকে বহু কোটি টাকা দান করে গেছে। কিন্তু দান না দাদন করেছে তা, অবশ্যই বিতর্ক সাপেক্ষ। কত টাকা তার কোনও হিসেব নেই। অঢেল অর্থ জমা হয়েছে এই বন্ড মারফৎ। চুরির টাকা না সৎভাবে উপার্জিত টাকা দান করা হচ্ছে তাও বোঝা অসম্ভব। বিজেপি'র কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা এমন 'বন্ডে' জমা পড়েছে। তার সামান্য ভগ্নাংশ নির্বাচনী প্রচারে ব্যয় হলে কোন সমস্যাই নেই। অঢেল অর্থ অকাতরে খরচ করা কোনও বিষয়ই নয়। অকাতরে টাকা খরচ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছর যাবৎ রাজ্য সরকার পরিচালনার সুবাদে তৃণমূল কংগ্রেসও অর্থবলে যথেষ্ট বলীয়ান। তাদের সব ধরনের চুরি বা লুণ্ঠন তেমন কোনও বিষয়ই নয়। অভিযোগ যে, রাজ্যে এক ধরনের মাফিয়ারাজ চলছে। কয়লা, বালি, নারীপাচার সবই চলতে দেওয়া হয় যদি ৭৫ শতাংশ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়। তার ওপর চালু 'ইলেক্টোরাল বন্ড' মারফৎ তাদের ঘরেও অনেক টাকা জমা পড়েছে। সেই অর্থরাশি ব্যবহার করে এই দলটিও সাজিয়ে গুছিয়ে রাজ্যের মানুষের ঘরে ঘরে সত্য মিথ্যা বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পঞ্চায়েত পৌরসভাগুলি দখলে রেখে প্রভূত সুবিধা আদায় করেছে এই দলটি।

ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতায় বলীয়ান। ভোট পরিচালনায় তাদের নিয়ন্ত্রণ একচ্ছত্র। তারা বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচনে কোন প্রার্থী কত টাকা খরচ করছে তার হিসাব খতিয়ে দেখতে পারে। প্রার্থীর খরচ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার একমাসের মধ্যেই সমস্ত হিসাব দাখিল করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নির্বাচনী বিধিতে কোন রাজনৈতিক দল কত টাকা ব্যয় করে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে ভূমিকা নেয় তার কোনও উর্ধসীমা ঘোষিত নয়। সে সব অর্থরাশির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব সেই অর্থে পেশ করতে হয় না। সুতরাং ভারতের নির্বাচনী বিধির এমন দুর্বলতার সুযোগে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য নেই এমন দলগুলির প্রচার চালানো খুবই কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই দুঃসহ বিষয়টি ইদানিংকালে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। টাকা খরচের বহর এত বেশি ছিল যে, সাধারণ মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। বিজেপি নয়তো তৃণমূল কংগ্রেস, এই দুইয়ের মধ্যেই পছন্দ ঠিক করা একমাত্র কর্তব্য বলে বহু মানুষ বোধ করেছেন। সারাদিন টেলিভিশন বা এগিয়ে থাকা সংবাদপত্রগুলি কী বলছে তার মাধ্যমেই মতামত প্রভাবিত হয়েছে. সরাসরি প্রলোভন দেখিয়ে বা উৎকোচ দিয়ে দরিদ্র মানুষের ভোট কেনার বিষয়টিও উপেক্ষা করার নয়। এমন করুণ অবস্থা এই রাজ্যে অতীতে কোনদিন ছিল না। এই কুৎসিত সংস্কৃতি অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসের আমদানি।

বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির নির্বাচনী প্রচার সমস্ত সাধ্য এক করেও তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি'র ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ফলিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থবল না থাকা দলগুলি প্রথমেই ব্রাত্য। তাদের কর্মীদের শত পরিশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্ম বৃথা হয়ে যায় টাকার খেলায়। আর সহজেই বোঝা সম্ভব যে, টাকার জোরে বাহুবলীদের ব্যবহার করা মোটেই কঠিন নয়। দেখা যাচ্ছে যে, যেইসব দলগুলির 'মানি পাওয়ার' ও 'মাসল পাওয়ার' যত বেশি—ভোটে জয়লাভ করার সম্ভাবনাও তাদের বেশি।

সহজ হিসেব অনেক সময় প্রবল প্রাতিষ্ঠানিকতা বিরোধী হাওয়ার দাপটে উল্টে যেতে পারে। এবারের ভোটে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সরকারের বহুমাত্রিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ অবশ্যই ছিল। কিন্তু বিগত বছরগুলিতে গণআন্দোলনের তীব্রতা এমন পর্যায়ে ছিল না যে, বামপন্থী দলগুলি তার যথাযথ সুযোগ নিতে পেরেছে বা পারতো। সব কটি বাম দলের মধ্যেই সাংগঠনিক দুর্বলতা কম বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে বা শহর-শহরতলীতে বিভিন্ন পাড়ায় সমাজবিরোধী শক্তিগুলি বিশেষ সক্রিয়। তৃণমূলীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনও উদ্যোগ দেখলেই আক্রমণ। পরোক্ষে ভীতি প্রদর্শন তো নিয়মিত চলছেই।

বামপন্থী দলগুলি বা বলা ভাল, বামফ্রন্ট দীর্ঘকাল রাজ্য সরকার পরিচালনায় নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার ফলে গণআন্দোলন সংগঠিত করার কায়দা কানুন সম্ভবত কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এবারের ভোটে তার অভাব বেশ ভালভাবেই বোঝা গেছে। অর্থবল এবং বাহুবল রুখে দেবার জন্য যে প্রক্রিয়া বেশ ফলপ্রসূ হতে পারতো, তা হল না। দীর্ঘ ৩৪ বছরে অনেক বামনেতার 'স্যার স্যার' শুনতে যে বদঅভ্যাস তৈরি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহসা সম্ভব হয় না। সহসা কেন, এতদিনেও সম্ভব হল না। এ প্রসঙ্গে বিশেষ যত্নশীল না হলে বিপদ আরও বাড়বে।

সরকারি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধাচরণ করতে বিজেপি যে পথ ধরেছিল তা বেশ তাজ্জব করে দেবার মতো। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি'র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তেমন কিছুই নেই। তৃণমূল কংগ্রেস দলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় একদশককাল বিজেপি'র হাত ধরেই চলেছে। দলনেত্রী বিজেপি'র মুখ্য সংগঠন আর এস এস-এর বিশেষ পছন্দের রাজনৈতিক নেত্রী। তাঁর এবং আর এস এস-এর উদ্দেশ্যও অভিন্ন। সম্ভবত সে কারণেই ভাড়াটে সেনার মতো তৃণমূল নেতাদের অনেকেই ভোটের আগে চলে গেলেন বিজেপিতে। তাঁরাই দলটির মুখ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে বসলেন। তৃণমূল বিরোধিতার প্রসঙ্গটি এক অতি নিম্নমানের খেউরে পরিণত হয়ে গেল। একদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অন্যদিকে উগ্র বাংলাভাষী প্রাদেশিকতা।

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে দু'টি দলের মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট কোন প্রভেদ খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। একজন যদি সরাসরি উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে সন্ত্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করে তো অন্যজন সেই সন্ত্রস্ত অংশের মানুষদের সমর্থন নিশ্চিত করতে হৈ হৈ করে ময়দানে নেমে পড়ে। পাল্টা সাম্প্রদায়িক প্রচার চলে। কেউ মন্দির তো কেউ মসজিদ!

একজন রামনবমীর সশস্ত্র মিছিল করে তো অন্যজন বজরংবলী নাম দিয়ে হনুমান পুজো নিয়ে সশস্ত্র মিছিল করে। বস্তুত, উভয়েই সাম্প্রদায়িক প্রচারে নির্ভর করে নিজেদের আখের গুছানোর অপকর্মে রত।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বেসর্বা ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবার পরেই তাঁর উত্তরাধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে চলে যান। তিনি অবশ্য প্রকাশ্যেই এসব করে হিন্দুত্ববাদী মানুষদের কাছে বার্তা দেন যে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ এবং যে কোনও বিপদে তিনিই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রস্তুত। আবার কিছুটা আর এস বজরং দল প্রভৃতির ফ্যাসিবাদী হুঙ্কারে গুটিয়ে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এক দুজন মুসলিম নেতাকে সামনে রেখে মোনাজাতের ভঙ্গি করেন। অর্থাৎ, দুই ধর্মবিশ্বাসীকেই আশ্বস্ত করেন তাঁদের লোক বলে। ভাঁওতাবাজির শেষ নেই।

এবারের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ে আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবৎ খুশি। তিনি মমতা ব্যানার্জীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিজেপি জিতলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভবনা তৃণমূল জিতলেও প্রায়ই একই থাকে। বিগত দশ বছরের ইতিহাস ও তথ্য পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, এই রাজ্যে আর এস এস বিশেষভাবে বলশালী হয়েছে। সুতরাং ওপর ওপর যাই প্রভেদ দেখা যাক্, আসলে উভয়েই এক।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটির এক মস্ত সুবিধা যে তাদের কোনও ঘোষিত নীতি এবং কর্মসূচি নেই। ফলত যখন যা সুবিধা তা করে যেতে কোনই বাধা নেই। একটি বিষয় সম্ভবত অনেকেই খেয়াল করেন না। বিগত সাত-আট বছরে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বিত্তহীন মানুষদের এক বৃহদংশ সরকারি অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে উঠেছেন। এই প্রক্রিয়াকে কেউ সরকারের জনতুষ্টির কর্মসূচি বলতে পারেন। কেউ জনমোহিনী কর্মকান্ডও বলতে পারেন। শেষ পর্যন্ত একই অর্থ বহন করে। মানুষ অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তত উৎসাহী নয় যতটা সরকারের দান-অনুগ্রহ পেতে উৎসাহী। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার ভয়ানক কুপ্রভাবে মানুষের নিশ্চিত জীবিকার সুযোগ সংকুচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নেই। জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী। মানুষ খাবে কী! মানুষকে তো বাঁচতে হবে। সরকার হাতে ধরে যা দেবে তাই বাঁচার পথ বলে মেনে নিতে হচ্ছে। আর ইদানিংকালে এই প্রক্রিয়াটি বেশ জোরালোভাবেই চলছে। সরকারি সহায়তার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল মানুষ সরকারি কর্তাদের অপকর্মের বিরোধিতা করতে সম্মত হয় না। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যাই বলুন প্রকাশ্যে বিরোধী অবস্থান নিতে শঙ্কিত বোধ করে।

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উত্তরাংশে বা হিন্দি বলয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার ও প্রসারে মনযোগী। বিগত সাত বছরে এই বিষ ব্যাপ্ত হয়েছে। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও জনমানসকে প্রভাবিত করা নিত্য নতুন ফন্দি ফিকির ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নে সংঘ পরিবার উদগ্রীব। দেশের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে সুকৌশলে। নানাভাবে এই অপকর্ম চলছেই। স্কুল শিক্ষার পাঠক্রম পাল্টে ফেলা হচ্ছে। অতীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজা-রাজড়া বা জমিদারদের জীবনী সম্বলিত ইতিহাস পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এ সব প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন সদর্থক প্রতিবাদের উদ্যোগ নেই। ওরা হিন্দুত্ববাদী প্রকরণগুলিকে আটকানোর কোন উদ্যোগ কোন কালেই নেয় নি। তাছাড়া, যেখানে সম্ভব সেখানে ওরাও একই দোষে দুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল পাঠ্যক্রমেও এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাস চর্চার সম্পর্ক নেই। কিছু পেটোয়া ইতিহাসের অধ্যাপককে ওরা ক্ষমতার জোরে ব্যবহার করছে। বিজেপি'র সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যই ওদের নেই।

Vol. 68 Issue No. 36 শনিবার ৩১ জুলাই ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

করোনায় মনের অসুখ

সনৎ ঘোষ

সমগ্র মানব ইতিহাসে গুটিবসন্ত, যক্ষ্মার মতো অনেকগুলো মহামারী অতীতে দেখা গিয়েছে। ধ্বংসাত্মক মহামারীগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল প্লেগ (Black death)। পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই মহামারীর কবলে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের ৭৫-২০০ মিলিয়ন মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৮৯৭ সালে ভারতের বোম্বাই শহরে প্রথম প্লেগ রোগ ধরা পড়ে এবং এটি দ্রুত সংক্রমিত হয়। প্লেগে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ দিশেহারা হয়ে শহর ছেড়ে পালায়। সে সময় এই রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রতিষেধকের কথা বলেন। শুরু হয়ে যায় লোকমুখে প্রচারিত বিবিধ টোটকা ব্যবহার। কেউ কেউ আবার হরি সংকীর্তনও শুরু করেন। কিন্তু এ সবে প্লেগের সংক্রমণ রোখা যায় নি। ১৯ শতকের শেষভাগে ওয়ালডেমার মোরডেকাই হাফকিন এই রোগের প্রথম ভ্যাকসিন তৈরী করেন। প্লেগ মহামারীর ১২৩ বছর পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সাথে ভারতে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়। করোনার প্রথম ঢেউয়ের সময়কালে বিজ্ঞানসম্মত কোন প্রতিষেধক না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করোনা জয়ের নিদান হিসেবে আমজনতার প্রত্যেকের বাড়ির আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালানো, কাঁসর-ঘণ্টা বাজানো, শঙ্খ ধ্বনি করা এবং গোমূত্র সেবনেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে এ ধরনের পরামর্শ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনেরই পরিচয় বহন করে। কথায় আছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে নতুন চেহারায় সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোখার অস্ত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা করেন। লকডাউনে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, কলকারখানা, ক্ষেতখামার, পরিবহন, হাটবাজার, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি বন্ধ থাকে দীর্ঘকাল। হঠাৎ লকডাউন ঘোষণায় ভিন রাজ্যের হাজার হাজার শ্রমিক সেখানে আটকে পড়ে। কোন পরিবহন না পাওয়ায় মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে তারা নিজ গ্রামে ফেরার চেষ্টা করে। অনাহারে-অনিদ্রায় পথে তাদের অনেকের মৃত্যু হয়। লকডাউনের ঘোষণা ছিল পরিকল্পনাবিহীন। লকডাউনের ফলে দেশের ও রাজ্যের সমস্ত স্তরের বিশেষ করে শ্রমজীবী খেটেখাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ে। ছোট-বড় শিল্পে কর্মী ছাঁটাই চলে বিপুলভাবে, গ্রামীণ অর্থনীতি পড়ে মুখ থুবড়ে। কোভিড অতিমারীর প্রথম ধাক্কায় (২০২০-২০২১) অর্থবছরে রুজি হারিয়েছেন কমপক্ষে ৯৮ লক্ষ চাকুরীজীবী।

করোনার প্রথম ঢেউয়ে দেখা গেল আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার দীনতা। কোভিডে আক্রান্ত ও মৃতের সঠিক সংখ্যা গোপন করার খেলা চললো কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে। একটা গোটা বছর অকল্পনীয় দুর্দশা সহ্য করে সমগ্র দেশ যখন ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করছে, তখনই জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্ব নতুন করে শুরু হলো করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে। দেশের জনগণের জীবন রক্ষা ভুলে আত্মপ্রচারে মগ্ন নরেন্দ্র মোদীর অদূরদর্শিতা, দাম্ভিকতা এবং করোনা সংক্রমণকে ছোট করে দেখার ফলশ্রুতিতে সংক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। এরমধ্যে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীর আগমনে কুম্ভমেলা গঙ্গার জলকে করোনা সংক্রমণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করলো। সেখান থেকে অগণিত করোনা রোগী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। নতুন কয়েকটি মিউটেশনের মাধ্যমে কিছুটা চরিত্র বদল করে হাজির হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এর সংক্রমণ ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। প্রতিদিন নতুন করে আক্রান্ত হলো কয়েক লক্ষ। এমতাবস্থায় হাসপাতালে বেড নেই, জীবনদায়ী ওষুধের অভাব, অক্সিজেনের জোগান অপ্রতুল। ইতিমধ্যে কোভিড ভ্যাকসিন বাজারে হাজির হলেও তা অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এপ্রিলে (২০২১) কাজ হারিয়েছেন আরও ৭৪ লক্ষ মানুষ। ফলে দেশে বেকারত্বের হার ফের উর্ধ্বমুখী হয়ে ৮ শতাংশে পৌঁছিয়েছে (তথ্য : সি এম আই ই)। লকডাউনে একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন, আশ্রয়হীন, উপযুক্ত চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় রয়েছে অপরদিকে কোভিডে মৃত্যু মিছিল ইতিহাস তৈরী করেছে। ইতিমধ্যে ভারতে কমপক্ষে ৪ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার তথ্য গোপন করে চলেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যে এতটা প্রাণঘাতী হবে তা ছিল কল্পনার অতীত। করোনা অতিমারী আমাদের কাছে দুঃস্বপ্নের অতীত এক চরম আঘাত। দেশের সরকার যদি সাবধানী ও মানবিক হয়ে সঠিক পরিকল্পনামাফিক কার্যক্রম স্থির করত, তা হলে দ্বিতীয় দফার এই সংক্রমণকে অনেকটাই লাগাম পরানো যেতো। কোভিড অতিমারির বর্ণনা আপাতত মুলতুবি রেখে এবার এই প্রতিবেদনের মূল ধারায় প্রবেশ করা যাক্।

করোনা আবহে গোটা পৃথিবী যেন পালটে গেল আচম্বিতে। ঘরবন্দি থাকতে বাধ্য হলো সকলে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া- প্রতিবেশী সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসীর মতো শুধু বেঁচে থাকা। কেবলমাত্র দূর থেকে ভার্চুয়াল সম্পর্ক (সম্ভব হলে) বজায় রাখার চেষ্টা করতে করতে এ এক দমবন্ধ অবস্থা তৈরী হয়েছে। এই দমবন্ধ অবস্থার বলি হয়েছেন প্রধানত প্রবীন ও নবীনরা অর্থাৎ বয়স্করা ও শিশুকিশোর বয়সীরা। লকডাউন আংশিক শিথিল হওয়ায় জিম, শপিংমল, বার, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি বর্তমানে খুললেও স্কুল-কলেজ কিন্তু আজও তালাবন্দি। কোভিডের মধ্যে কোটি কোটি ভোটারের জন্য রাজ্যে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা গেলেও প্রায় দেড় কোটি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা গেল না।

আমাদের রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত পরীক্ষা নির্ভর। শৈশবকাল থেকে শিশুর শিক্ষার ভিত গড়ে ওঠে স্কুলেই। এমতাবস্থায় স্কুল জীবনের শেষ দুটি পরীক্ষা (মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সমতুল) কোভিডের কারণে বাতিল করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ নম্বর দিয়ে যদি পরবর্তী ধাপে উন্নীত করা হয়, তবে সেই ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু জানতে পারবে না যে তাদের পূর্বের শ্রেণির পড়াশুনার মানটা কি ছিল? কার্যত তাদের যোগ্যতায় কোনো মূল্যায়ণই হবে না। বরঞ্চ এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সারাজীবন এই গ্লানি বহন করে চলবে যে তারা পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করেছে।

অথচ এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা কোনমতেই দায়ী নয়। এ ব্যবস্থা যেন মুছে দেবে তারুণ্যে ভরপুর শিশুকিশোরের জীবন শুরুর সব মূলধন। প্রত্যেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে শৈশবেই স্কুলে ভর্তি করেন। পাঠ্য বিষয় মুখস্থ করানোই বিদ্যালয় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তা সকলেরই জানা। স্কুলে গিয়ে প্রত্যেক শিশুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ওরা একসাথে দুষ্টুমি করে, খেলা করে, নিজের টিফিনের ভাগ দেয় বন্ধুদের। আনন্দের সাথে ওরা গল্প করে আবার পড়াশোনাও করে; এতে ওদের মানসিক বিকাশ ঘটে, শরীরও ভালো হয়।

করোনা অতিমারী আবহে খেলাধূলা যেন শিশুদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, আজ তাদের গৃহবন্দি জীবন। ঘরবন্দি শিশুদের সঙ্গ দিতে বাড়ীর বড়োরা এগিয়ে এলেও সেটা ওদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আজ তারা মানসিক অবসাদে ভুগছে। করোনার আবহে সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। প্রায় দেড় বছর স্কুল বন্ধ। অনলাইন এডুকেশন অধিকাংশ বাচ্চাকেই আর তেমন উদ্দীপিত করতে পারছে না, ফলে তাদের পড়াশুনার ওপর আকর্ষণ কমে যাচ্ছে।

আগে মোবাইল হাতে নিলে মা-বাবা ধমক দিতেন। কিন্তু এখন স্কুলের পড়াশোনার জন্য অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ডেটা প্যাক যুক্ত মোবাইল। অনলাইন ক্লাস চলাকালীন অনেক শিশুছাত্র ভিডিও গেম খেলে বা অত্যাধুনিক স্মার্ট ফোন নিয়ে নাড়াচাড়া করে। লকডাউনে বাড়ির বাইরে বেরুনো বারণ। খেলার মাঠ, স্কুলের বন্ধু, ছোটবেলার দুষ্টুমি প্রভৃতি শৈশবের ভালো থাকার পাসওয়ার্ডগুলো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে করোনাকালে। যারা বয়সে একটু বড়, বয়ঃসন্ধিতে টিন-এজার; তারা অনেকে নিঃসঙ্গতায় ভুগে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। করোনার চাপে, পরিবেশগত কারণে তারা যে আসক্ত হয়ে পড়ছে, তা অনেকক্ষেত্রেই তাদের বাবা-মা'র পক্ষে সামাল দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

করোনা অতিমারীর আবহে তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণামূলক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের অফিসের কাজের চাপ ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ঠেলায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। সংসারের বিভিন্ন ঝক্কি সামলিয়ে বাড়ির সকলের মাঝে বসে অফিসের কাজ চালিয়ে যাওয়া বেশ চাপের। এক বছরের ওপর অফিসে উপস্থিত না থেকে তাদের সহকর্মীদের সাথে মনের আদানপ্রদানও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমীক্ষায় প্রকাশ, ওয়ার্ক ফ্রম হোমের বর্ধিত কাজের চাপে কর্মচারীরা তাদের কাজে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে।

কোভিড যে শুধু মানুষের শরীর আক্রমণ করে, তা নয়। আক্রমণ করে মানুষের মনকে, মনোবলকেও। করোনার কারণে আমাদের সমাজের একটা বড় অংশের মানসিক রোগের শিকার হয়েছেন, হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও হতে পারেন এমন আশঙ্কা রয়েছে। মারণ এই করোনা রোগ শুধু শ্বাসতন্ত্র, ফুসফুস বা মস্তিষ্কের ক্ষতি করে না, নিউরো-সাইকায়াট্রিক ক্ষতিও করে। কোভিড আবহে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণেরও হেরফের ঘটে। একদিকে ভয়, অন্যদিকে চরম একাকীত্ব—করোনাকালে বয়স্কদের একটা বড়ো প্রাপ্তি। নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব এ রোগের প্রধান অনুষঙ্গ।

করোনা নিশ্চয়ই একদিন চলে যাবে, লকডাউন ক্রমশ উঠে যাবে, আমাদের পৃথিবী আবার হয়তো আগের মতো হয়ে উঠবে কিন্তু মাঝের এই বিরাট সময়ে কোভিডের কারণে যে পরিমাণ ক্ষতি হলো তাকে অপরিসীম বললেও হয়তো অনেক কম বলা হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলো, কর্মচ্যুত হলেন বহু মানুষ, বেকারত্ব শিখরে পৌঁছুলো, মুদ্রাস্ফীতি উঠলো চরমে; সর্বোপরি নিরাপত্তাহীনতা মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দরদী মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গঠন করে করোনা মোকাবিলা করলে সম্ভবত এই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানো যেতো।

কিউবার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র

সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক কৃষক ও শোষিত মানুষের সমাজতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে গত ১১ জুলাই কিউবার অতি অল্প সংখ্যক মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনকে প্রতিবিপ্লবী অপপ্রয়াস বলে অভিহিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রত্যক্ষ ইন্ধন এবং প্ররোচনায় এমন ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য বহু প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে অসহনীয় অর্থনৈতিক অবরোধ বিগত প্রায় ছয় দশক যাবৎ চালিয়ে যাচ্ছে। ইদানিং আরও কঠোর অবরোধের হিংস্র আয়োজন চালানো হচ্ছে। কোভিড অতিমারিকালে কিউবার সাধারণ জনজীবন বাস্তবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওই দেশের একাংশ মানুষকে অনৈতিকভাবে প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ডে ব্যবহার করছে মার্কিন প্রশাসন।

আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী অপশক্তিগুলির এই অপচেষ্টার গভীর নিন্দা করছি। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় কিউবার সমর্থনে সবকটি রাষ্ট্রের সমর্থন থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল-এর বিরোধিতায় তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উপরন্তু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মদত দেবার অভিযোগে কিউবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ।

কিউবার সঙ্গে পূর্ণ সংহতি জানায় আর এস পি। কিউবার সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনও ধরনের সহায়তা করতে আর এস পি প্রস্তুত।

এমন এক ষড়যন্ত্রমূলক পথে কিউবার জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ সর্বতোভাবে প্রতিহত করতে ওই দেশের জনগণ প্রস্তুত। কিউবার বর্তমান সরকার মার্কিন প্ররোচনায় যারা পথে নেমেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনও শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ বর্তমান রাষ্ট্রপতি কম. মিগুয়েল ডায়াজ কানেল সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দ হাভানার পথে বিপ্লবী সরকারের সমর্থনে মিছিল করেছেন। দেশের অন্যান্য অংশেও সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবী সরকারের পাশে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

আর এস পি'র পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রেমী সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান— সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বানচাল করতে নিজের নিজের দেশের পরিসরে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্রতর করার বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কঠিন সংকটের আবর্তে বিশ্ব পুঁজিবাদ। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রমাণিত সত্য যে, নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সাধারণ মানুষের জীবনে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করেও পুঁজিবাদ তার অমোঘ সংকট থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। কিউবার বিপ্লব এবং কিছুটা আপস করে চলা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিউবার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো সমস্ত দেশের গণতন্ত্র ও শান্তিপ্রিয় মানুষের একান্ত মানবিক কর্তব্য।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-